চলো।

সুতরাং আমারা সবাই পথের ধারে ঝাঁকড়া একটা উইলের ছায়ায় এসে বসলাম। আকাশে একটা মেঘের মাঝে গড়ে যায় মাঝে কবে চারদিক।

নিচু পথের ছুত্তার আধিরক্ষিতবারী রুহ রাইফেত। দুরে আগনের হলকা ফুটছে।

রুদ্ধ করেকটা রাইফেতের শিশ ছিঁড়ে নিয়ে আমার হাতে দিলেন। ‘চাহেই, জলের অভাবে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গয়াছে।’

প্রতির নিত্যপরিহাস, চারানীয়ের ছড়াগো নিয়ে আমরা নানান আলোচনা করলাম। রুদ্ধ সারাক্ষণ আমাদের কথা কান পেতে শুনলেন, মাঝে মাঝে দীর্ঘস্বরে ফেলে ভাঙা। ভাঙা গলায় ছুচারচুরি মশাবাও করলেন। হঠাৎ এক-সময় কুকুড়া শুকিয়ে আঁধার ফুটায়। হয়ে যাওয়া রাইফেতের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, ‘আচ্ছা ও বেঁচে থাকলে, তার ছোট ছোট হাতে নিজেই ক্ষেতের কাজে লেগে পড়তে।’

রুদ্ধ ধীরে ধীরে মাঝা নাড়লেন। ‘ইই, হয়তো! সারাধিন নিজের কথা ওর খেয়ালই থাকতে না।’

ধুঞ্জনের কাউকে আর কোন কথা বলতে না দেখে জিগেস করলাম,

‘আপনার কার কথা বলছেন?’

‘ছোট একটা মেঘের কথা।’

রুদ্ধ করন চোখে তাকালেন। ‘আমাদের বাড়িতে থাকতে। এক ভর্তরলোকের মেয়ে।’

‘সত্যি, তারি চমৎকার মেয়ে।’

ঋষি ধুঞ্জনেই ধীরে ধীরে এমন কাতর যরে কথাগলা বললেন, যেন আমার রুক্ষের মধ্যে গেথে গেলা আর তোর ভাঙা ভাঙা। কোন প্রতিরুদ্ধ শব্দ আমার কানে মশাব উচ্চারণের মতো মনে হলো। তারপর ঋষি এমন সুন্দর-ভাবে সমস্ত কাহিনীটি বলে চললেন, যেন একজনের মুখ থেকে অপ্রত্যাশিত কথাটা কেড়ে নিচেন। আর আমি ধুঞ্জনের মাঝখানে বসে অবাক বিস্ময়ে একবার এর মুখের দিকে একবার ঋষির মুখের দিকে তাকাবাঁচি।

‘একবার এক ভর্তরলোক একটা মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে আমাদের গ্রামে এলো। এরমধ্যে রুদ্ধের কাছে বললো, ‘আপনারা কেউ দয়া করে এই মেয়েকে রাখুন।’
গফিক শেষ গল্প

"অর্থাৎ, আপনারা কেউ মেয়েটিকে মানুষ করুন।" রুদ্র আমাকে বুঝিয়ে দিলেন।

"তারপর ওরা মেয়েটিকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলো।"

"তুমিই প্রথম দেখলে ঠাঁকুয় মেয়েটা হিংসি করে কাপড়ে যাচ্ছে।"

"সত্যি, এদের একটা মেয়ে, এমন চমৎকার...ভাবাই যায় না।"

"ওকে দেখে আমাদের তে। তখন কাল্প্ত পাবার যোগ্য ছিল।"

"ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, উনি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"কেননা মেয়েটা যে-জায়গা থেকে এসেছে..."

"এটা তে। পুকুরম, তাই না।"

"হাঁ। প্রথমেই আমরা করলাম কি, তাপচুলীর ধারে উঁচু পাটাতেনোটার ওকে নিয়ে এসে বসালাম।"

রুদ্র গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "আমাদের তাপচুলীটা ছিলো। যেমন বড় আর তেমনি গরম!"

"তারপর আমরা ওকে থেতে দিলাম।"

"আর ও তখন কেমন হবেছিলো।?"

"হাঁ, উচ্চরের মতো। কুচকুচকে কালো। চোখের মণি থেকে চাপা হাসিয়ে যেমন ঠিকের পড়েছিলে।"

"আর ও নিজেও ছিলো। ঠিক বাঁধ। একটা খরাগোলের মতন—যেমন চঞ্চল তেমনি মসৃণ।"

"একটু সামনে নেওয়ার পরেই মেয়েটার চোখ দিয়ে ঠিকপ করে জল গড়িয়ে পড়লো। ও বললো, 'আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।'"

"তার করেকদিন পরেই মেয়েটা কি মুদ্রা নিজেকে মানিয়ে নিলো।? রুদ্র। উজ্জ্বল চোখে রুদ্রের মুখের দিকে তাকালেন।"

"খুব মুদ্রা!"

"রতিন প্রকাশ্যতির মতো। খানে ওখানে দেখানে, আমাদের সারা ঘরে যেন নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা গুছেছে, ওটা ঠিক করে রাখছে। জলের পাতাগুলো নিজের হাতে বয়ে নিয়ে গিয়ে শুরুর মানুষদের থেতে দিছে। ওদের মুখের কাছে যুখ নিয়ে গিয়ে আদর করছে। উঃ, সে এক দেখার মতো। দৃঢ়!"
হাসতে হাসতে ছুঁকনেই চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।
‘আর গুয়ারের ছানাগুলো কেমন ওর হাতে নাক ঘষতো।’
‘গুয়ারছানাগুলোকে ও পারিয়েছে দিতে।’ বলতেও, ‘সব সময় ওদের ঘরে আটকে রাখা ঠিক নয়।’
‘এক সপ্তাহ মধ্যে ও বাংলাদেশের বেড়াটে বেঁধে সব ঠিক করে ফেললে।’
‘আমাদের ছুকনের কাজও ও করে দিতে।’
‘সব সময় হাসছে খেলছে ছোট ছোট পায়ে সারা। উঠলেন ঘরে বেড়াছে।’
‘তারপর হঠাৎ একদিন সব চুপচাপ হয়ে গেলো।’
‘যেন এক ফুঁয়ে সব আলো কে নিষিদ্ধে দিলে।’
‘কাছাড়ে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, যেন ওর ছোট বুকটা কেউ তেঁতুল হুমান। করে দিয়েছে। আমি তো। অবাক। কি হয়েছে, কি ব্যাপারে—কিছু বুকতে পারছি ন। আমিও কেন্দে ফেললাম। অথচ কেন কাছাড়ি আমি নিজেই জানি ন। ওর গলাটা জড়িয়ে ধরলাম। আমরা ছুকিয়ে তখন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাছাড়ি’
‘সেইটেই বাস্তবিক। হাজার হোক আমাদের কাছে ও ছিলো নিজের চেলেমেয়েদের চাইতে অনেক বেশি।’
‘আর আমারাও তখন নিঃসন্ধয়। বড় ছেলে রয়েছে সেনাবাহিনীতে, ছোট ছেলে কাজ করছে সোনার খনিতে থেকে।’
‘আর ওর বয়স তখন সবে সতেরো।’
‘সতেরো, কিন্তু দেখলে মনে হয়ে ঠিক যেন বারো।’
‘হীরা, ঠিক যেন ছোট পাক। ফলাটি।’
‘তারপর ওর কি হলো।’ উদ্যোগীর হয়ে আমি জিগেস করলাম। বুঝলাম মনে মনে আমি কুতুহলী হয়ে উঠলাম।
‘তারপর? রুদ্ধ রুদ্ধ খালি করে গভীর একটা দীর্ঘকাল ফেললেন, যেন বায়াসে কে হাহাকার করে উঠলো।
রুদ্ধরুদ্ধ কুঁড়ি চিবুক বয়ে তখন করছে জলের ছুটি ধারা।’
‘তারপর ও মারা গেলো।’
‘মারা গেলো।’ আমি বিস্ময়ে স্ক্রুকে হয়ে গেলাম।
‘হীরা, আগস্ত্য।’
‘দেকি! কি করে মারা গেলো।’
'প্রাদুর্ভ অরে।'

'মাত্র চুব বছর ও আমাদের কাছে ছিলো। গ্রামের সবাই ওকে চিনতো। তাছাড়া ও লেখাপড়াও জানতো। বড়দের আলোচন। সভায় গিয়ে বসতো। মাঝে-মধ্যে হচ্ছাটে কড়া মস্তবাও করতো। কিন্তু কেউ ওর কথায় কিছু মনে করতো না। কেননা ও ছিলো যেমন নরম, তেমনি বুদ্ধিমতী।

কিন্তু সবচেয়ে বড় ছিলো ওর গৃহন। দেবদুপুরের মতো সুন্দর একটু স্নায়। সবার টেপে কড়া ও আরাগ্ন পেতো, মনে করতো এ হংক তার নিজের। শহরে ভ্রমরের মেয়েদের মতো। ও যেমন পেলেকের ক্রক পরতো, চুলে ফিরে বাগতো, জুতো পায়ে ঘুরতো, বই পড়তো, তেমনি আমার সবার দ্রুততর নিজের রুক পেতে নিতো। আমাদের দ্রুতনের তো। ওর কিছুই আজন। ছিলো না। আমরা যদি জিগেস করতাম, 'তুমি এসব কি করে জানলে, সেনা?' ও হেসে জবাব দিতো, 'বারে, এসব সে বয়েতে লেখ। আচার!' তারো একবার, এ হেস একটা মেয়ে, হুদিন বাদেই যার বিয়ে-থা হবে, তাকে কি না ওর এখানে পাঠালো মরবার জন্য মনোযোগ করি নাও।

'সবাইকে ও সেবারে শিক্ষা দিতো, দেখলে তোমার হাসি পেতো। এতে হচ্ছুন একটা মেয়ে, ছোট বড় সবাইকে বললে, 'এটা কোথা না। ওটা কোথা না। ওটা আমনার করা উচিত নয়...'

'উ! ওর আজনও ছিলো বলহারি।'

'আর সবার সবকিছুর জন্যে ও উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতো। কারুরা অসুখ হয়েছে, অমনি ছুটেলো তার সেবা করতো। কেউ বিপদে পড়েছে...'

'মুন্যাতক্ষণার মধ্যে সবার জন্যে ওর প্রাণ ছুটকট করতো। আমবার ওর জন্যে পুরুতের বাবারও করিয়েছিলাম, তবেছিলাম যদি ওকে ফিরিয়ে আন। যায়। কিন্তু ও ফিরলো না। আমাদের ছেড়ে চলে গেলো।'

রুদ্রের শেষে কথাগুলো আমার বুকে ঝরিয়ে ফলার মতো এসে বিকল্পন। ওর অংশক্ষেপ অভিযোজিতে আমার বুকের ভেবে রোপণ যুথচার উঠলো।

'সাহা গ্রাম ভিড় করে এলো আমাদের উঠলেন। সবাই বললে, 'কেমন করে হলো? এ অসম্ভব।' সত্যিই ওর ওকে ভীষণ ভালবাসতো।'

'বুধ দীর্ঘকালীন কেললেন। তাছাড়া এমন মেয়ে আর কোথায়ই বা খুজে পাওয়া যাবে।'

'গ্রামের সবাই মুল ওকে কবর দিলো। পাপমাঠের চালিশদিন পর
একটি মেয়ের অবদান

আমাদের মনে হলো, ওর আঘাত শান্তির জন্য আমাদের তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে গেড়ে উঠেছিল। প্রতিবেশীরাও একমত হলে। ওর বললেঃ আপনারা নির্দিষ্টঘাত চলে যান, কোন পিছু-টিনই আর আপনাদের বাধা দিতে পারবে না। হয়তো আপনাদের প্রার্থনায় ওর আঘাত শান্তিই পাবে। তাই আমরা বেরিয়ে গেড়ে দিলাম।

'তার মানে আপনারা ওই মেয়েটার জন্যই বেরিয়ে গেড়েছেন,' শুক বিশ্বয়ে আমি অবাক হয়ে জিগেস করলাম।

'হ্যা, নিস্পাপ ওই মেয়েটার জন্য। যত পাপতি আমরা হই না কেন, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা। নিশ্চয়ই স্নেহে পাবেন ওর পাপ কমা করবেন। বাংলার উপরে প্রথম সম্প্রয়, মঙ্গলবারে আমরা যাহা শুরু করেছিলাম।'

'গুরু সেই মেয়েটার জন্য?' আমি পুনরাবৃত্তি করলাম।

রঙ্গ বললেন, 'হ্যা আগ্রহক, গুরু সেই ছোট মেয়েটার জন্য।'

আমি বারবার ওদের মুখ থেকেই সন্নতি চালিলাম এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ওরা চলেছেন গুরু সেই মেয়েটির আমার শান্তির উদ্দেশ্য প্রার্থনা জানাতে। আমার কাছে এ যেন বিশ্বাসেরও অস্তিত্ব বলে মনে হলো। কেন না কোনমতেই আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না—কাও চোখ, গুরু সেই মেয়েটির জন্যে এই কঠোর অর্থ কি করে সংস্কার করতে। কিন্তু সত্যই স্বর্ণ উদ্দেশ্যের কথা তেমন আমি এ ছাড়া আর অন্য কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না।

'এবং সত্যই সারাটা পথ আপনারা পায়ে হেঁটে এসেছেন?

'না, সারাটা পথ বললে হয়তো মিথ্যে বলা হবে। কখনও কখনও হু-চারট গাড়িয়ে চড়েছি। হয়তো। একদিন চড়েছি, পরের দিন আবার হেঁটেছি। একটি একটি করে পরিশ্রমের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছি। এই রুদ্ধ বয়সে সারাটা পথে হ্যাঁটা সংস্কার নয়, সে কথা ঈশ্বরও জানেন।'

'আপকে ও থাকলে...'

তারপরেই আবার শুরু হলো। এ শান্তি-রকে মৃত্যুবায়ু সেই মেয়েটি সম্পর্কে অশীম আগ্রহে তাদের পরম্পরার কথা কেড়ে নেওয়ার পালা।

* 

ঘটো, ছোট পরে আমরা। আবার যাত্রা। শুরু করলাম। মেয়েটির জন্যে সাধ মন আমার আক্ষর হয়ে রইলো, অথচ হাঁকার চেষ্টা করেও মেয়েটির স্পষ্ট
কোন ছবি আমি ফুটিয়ে তুলতে পারিলাম না। আমার কল্লুনাশক্তির এই অক্ষমতায় আমি নিজেই বুকের মধ্যে একটি যন্ত্র অনুভব করলাম।

অবশ্য আমাদের সেই দিনগুলোতে যে কোন রাশিয়ানের পক্ষে ভালো এবং সুন্দর কিছু কল্পনা করা সত্যিই খুবই কঠিন।

অন্তর্ভুক্ত পরেই আমাদের পেছনে দেখলাম খোড়া টান। একটি একো।
আমাদের অভিবাদনের প্রভাবের ইউক্রেনিয়ান চালকটি মাখা থেকে টুপি খুলে বাম সম্ভাব্য চোখে তাকালো।

'আমূন, আমাদের হুজুনকে পরের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিই।'

ওয়ালি ভেতরে প্রবেশ করলেন। খুলোর মেঝ উড়িয়ে গাড়ি ছুটে চললো।
ইটিতে ইটিতে আমি সেদিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রহিলাম। দূরে একটি একটু করে গাড়িটি ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। তার ভেতরে রয়েছেন অশীতিপর হুজুন রুদ্ধ, হাঁস। সুমদ্র পথ অতিক্রম করে নিঃস্পর্শ একটি মেয়ের তালোবাসার
বদনামকে সমর্পণ করে রাখার জন্যে চলেছেন প্রার্থনা জানাতে।

১৮৯৫
নীল-নায়ন

গোলাগাল বিষ্ণু চেহারার একজন ইউনিয়ন সহকারী পুলিস অফিসার তার একটি দিকে তা দেখছে আর হাজার দিনের উদাস চোখে বাইরে একটি দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই অক্ষরার্থ ঘরের ভেতরটা এমন নির্দিষ্ট নিচু যা ঘরের দোলকের মুখে টিকটিকে আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না। অথচ বাইরের একটি দিকে তারি সুন্দর, যেমন উজ্জ্বল তেমনি খোলামেল। মাঝখানে তিনটি বার্চ শুক ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার সেই নিষ্ট ছায়ায় কুথিনি, যে একটি আগে পাহাড়ের জলে এখানে বদলি হয়ে এসেছে, এখন ঘড়ির জলে রাখা একগাদা শুনে। ঘাসের উপর বসে বিচ্ছেদ। এই চূড়া সহকারী পুলিস অফিসার পদটি বেলার কুঁড়ি উড়েনি করিয়ে তুললেন। কেননা তাপসা গরম আর চার দেওয়াল হেঁচার এই ছোট ঘুড়ির মধ্যে রেখার উপর-ওয়ালারকে যদি না ঠায় বসে থাকতে হতো, তাহলে না সুখ ও ধুমতে পারতো। ওর মনে পড়লো একসময়ে কোনো বুকে উনিশ বার্চের এই ছায়ায় সুরক্ষিত ঘাসের গাদায় ঘুরে বুখিরে নিতেন। তবে সেই আরামের আমের স্থানে উপস্থিত করতেই আড়ম্বর। বন্দে হাই তুললেন, মনে মনে আবার কিছুও হলেন। অতশ্চ ইচ্ছে হলো কুথিনিকে স্বাগিতে দিতে।

'হেই! হেই কুথিনি! এই শুরুরের বাছাই।' ঘরের ভেতর থেকেই ত্যন্ত মনে চাপা গর্বন করে উঠলো।

ওর গেহনের দান। ঠেলে কে যেন ভেরোদের প্রবেশ করলো। কোনদিকে একটি চোখে দেখল না বেঁধে উনি আগলে চোখে জানলা দিয়ে যায়। ঘরের দিকে তাকিয়ে উঠল। তখন কে ভেরোদের প্রবেশ করলো, কে ওর পাশে এল রায়ালো, কার পায়ের চাপে কাঠের মেঝেটা ছুলে উঠলো, এসব উনি এমন কিছুই লক্ষ করলেন না। যদিও কুথিনিকেও কোন মন্ত্রণ নেই। মাঝারি নিচে হাত রেখে ও নিশ্চাকে তুমি। বিভ্রমের বন্ধনে টঁকে উঠে উঠতে আকাশের দিকে। পুলিস অফিসারের মনে হলো। এমন সুন্দর পুঁকি সুতে ওকে নাক ডাকতে শুনতে যে নিজেরই একটি গড়িয়ে নেবার বাসনা হচ্ছে। কিন্তু এখন তা আর সম্ভব নয়। ইচ্ছে ইচ্ছে হলো। ছুটে গিয়ে ওর ছুঁড়িতে এইচ জেরে লাধি করিয়ে দাঁড়ি ধরে হিসাবিত করে ছায়া থেকে বোঝায়ে টেনে আলে।
গাছের শেষ গল্প

‘হেই, হেই বাটা! কুস্তকরণের বাচ্ছ। শুনতে পাচ্ছিস না?’
‘এখন আমার ডিউটি, স্যার।’ গেছেন দেখতে যেন আলাদা কথাটা বললে। যাবে ঘরের পড়ালোকো পুলিসের একটি দিকে তাকালেন। সেখান চোখে ও এমনভাবে আঁখি পরের যেন আদেশ পেলেই বলে যাবে।
‘আমি কি তোমাকে ডেকেছি?’
‘না, স্যার।’
‘আমি কি তোমাকে কিছু জিগিস করেছি?’ পড়ালোকের গলায় চড়ে উঠলে। এবার উনি চেয়ে ঘুরে বসলেন।
‘না, স্যার।’
‘তাছাড়া মাথায় কিছু চুঁড়ে মারার আগে সোজা। এখান থেকে দুর হয়ে যাও।’ তার হাতে চেয়ারের পেছনটা আঁকড়ে ধরে বাঁ হাত দিয়ে উনি সতিই তখন টেবিলের উপর কিছু খোঁজার জন্য হাত ডাক্তলেন। এহরী তত্ত্বকে মাথা নিচু করে দরজা দিয়ে বাইরে পা। বাড়িয়েছে। চোখের মাটি এই ধরনের নিঃশ্বাস প্রত্যাহার সহকারী একজন পুলিসের কম্যুনিটি কাছে কামা নয়, তাই মনে মনে তিনি অপমানিত বোধ করলেন। তাছাড়া মাথামোট কুঁড়ের বাদশাহকে উপযুক্ত শান্তি দেওয়াও দরকার। আলস্ন মেলার জন্যে বছ কাজ, এমনকি অপরাধিক অনেক ব্যাপার তখন তার মাথায় গিজিস করছে।
‘এই ষে শোনি।’ উনি আবার ডাকলেন।
এহরী দরজার সামনে থেকে ফিরে এসে শক্ত হয়ে ঢাকাল। চোখের দৃষ্টি এখন ওর বদলে গেছে।
‘এই ষে, বেঁধে মাথা! যাও, উঠোনে গিয়ে কুখেরিন গাড়িতে কে শিগিস জিগিস দাও। দিয়ে বললে যে এটা নাক ডেকে ঘুমবার জায়গা নয়, বুঝেছে।’
‘ইলা, স্যার। একজন মহিলা আপনাকে।’
‘কি বললে?’
‘একজন মহিলা।’
‘মুখ্য! কি চায় ও?’
‘আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, স্যার।’
‘যাও, গিয়ে জিগিস করে এসো—কি জন্যে ও দেখা করতে চাই।’
‘আমি জিগিস করেছিলুম, স্যার। আমাকে বললেন না, বললেন আপনার সঙ্গেই উনি কথা বলতে চান।’
’নিকুচি করেছে তোর মেয়েমানুষেরে! ওকে আসতে বলে। কি, কম বয়েস তে? ’

’হ্যাঁ, দার।’

’টিক আছে। নিয়ে এসে।’

প্রহরী বেরিয়ে যাবার সম্ভ সঙ্গেই উনি চেয়ারে ঘুরে বসলেন। চেরিল থেকে তুলে নিলেন কয়েকটা কাগজ। এখন তার কণালের ভাজে ভাজে ফুটে উঠেছে কাঠামোর মধ্যে কয়েকটি রেখ।

পেছনে শুরুনেলা ঘাসঘর মুছে খসখস শুন।

’বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?’ সামান্য একটি ঘুরে উঠেয় চোখে উনি তাকালেন। তরুণী নিঃসব্দে অভিবাদন জানাতে মন্ত্র পায়ে টিট দিয়ে এগিয়ে এলে। চোখ। চোখের পাতাহ্বটি ইত্যা নামান। নিঃস্বার্থ ঘরের মেয়েদের মতে। নিতাঙ্কিত সাধারণ পোশাক। মাঝার ওপর দিয়ে একটা শাল ঝাড়ানো।

গলার কাছে শালের কিনার ছুটে সুন্দর হাতের দীর্ঘ গলের আঙুল দিয়ে চেপে রয়েছে। দীর্ঘ নিটেল শরীর, গীনায়ত পরিপূর্ণ বুক, উঁচু কপাল।

অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি চাপ। আর গভীর। বছর সাতাশ বয়েস। দীর্ঘ শান্ত পায়ে ও এগিয়ে এলে। ভঙ্গিটা দেখে মনে হলো। যেন বলতে চাইছে ফিরে যাওয়াই ভালো ছিল।

চোখে চোখ রাখতেই পদসিবলো মনে হলো।—মন্দ নয়।

’দুর্ভু, আমি। মনে আমার শুধু একটা।’ প্রতিবাদ হলো। গভীর অগ্র মিষ্টি একটা কঠোর। কিন্তু শেষ হবার আগেই তরুণীর কঠ যেন বুঝে এলো। আনন্দ হলো। তার সমুদ্র-নীল আঁক চোখের দৃষ্টি।

’বলুন।’ পুলিস ভঙ্গিতে পদসিবলো। চিবিরে চিবিরে জিগসার করলেন, ’হ্যাঁ, এবার বলুন। আপনার শুধু।’ কি যেন একটা জিগসা করছিলেন। মনে মনে তারিফ করলেন—শুধু রূপসী নয়, রসালোও বটে।

’আমার মনে আমি শুধু একটা।’

’থামলেন কেন, বলুন?’

’না, মনে। আমি শুধু একটা কার্ডের জন্য। এসেছি।’

’কার্ড!’ পদসিবলো যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ‘কিসের কার্ড?’

’আপনার এখান থেকে যে কার্ড দেন।’


'বাসাবাড়ির জন্য?'

'না না, ওসব নয়।'

'তাহলে?'

'আপনার যে কার্ড মেয়েদের দেন... তরুণীর জিন্দ বেঁধে গেলো। যেন এক ঝলক রক্ত চলকে উঠলো ওর সারা মুখে।'

পদবিলে। অুঃচুকে তাকালেন। অতুল একটা হাসি খেলে বেড়াচ্ছে ওর হাঁচোকে। 'মেয়েদের! কোনো ধরনের মেয়েদের বলুন তো?'

'অন্য ধরনের মেয়েদের...মানে রাজিরে যেসব মেয়েরা রাঙ্গামাটী ঘোরে।'

'ও হে। বুঝেছি বুঝেছি, বেশ্যা তো?'

'হো, আমি ওদের কথার বলচিলাম।' তরুণী দম বন্ধ করে এমনভাবে হাসলে, যে কথাটা একত্রিত ও উচ্চারণ করতে পারছিলা না, দুঃখীবোধ করছিলা, তা যেন এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে।

'ও, এই কথা।' একত্রিত মনের মতো ধোকার পেয়ে পদবিরলে। যেন সারাব হয়ে তলালেন।

'হো, আমি ওই কার্ডের জন্যেই এসেছি।' ছোট্ট একটা দীর্ঘকাস ফেলে তরুণী সামনের চেয়ারে আলাদা করে বসলে।

'তার মানে আপনি একটা বেঁধায় খোলার কথা ভাবছেন, এই তো?'

'না, আমি আমার নিজের জন্য চাইছি।'

'আ-ছা?' দরজার দিকে একবার আড়ালোচে তাকিয়ে উনি তরুণীর দিকে যুক্ত এলেন। 'তা আপনার পুরনো কার্ডটা। কোথায়?'

'পুরনো কার্ড! আমার তো কোন পুরনো কার্ড নেই।'

'তার মানে পুলিসকে না জানিয়ে আপনি বুঝি এতদিন গোপনেই কাজকর্ম চালাচ্ছিলেন?' স্থির চোখে উনি তরুণীর মুখের দিকে তাকালেন। কুড়াকুড়ি চোখের মশালো এখন তিরনির করে কাঁপছে। একটা হাসি এসে পেঁচেছে তরুণীর হাতের ওপর। 'অনেকেই অবস্থা তা করে। এখন আপনি নিরাপত্তার জন্য পুলিসের দায়ে নাম লেখাতে চান, কি তাই তো?'

'না, পেঁচুন,' তরুণী নামিয়ে নিলে। তার নীল চোখের পাতাঘূঁটো। 'আমি এর আগে এ কাজ কখনও করিনি।'

'তাই না কি! সত্যি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

চোখের পাতা তুলে তরুণী অক্ষুন্নবরে বললে, 'মেলার জন্যে এখানে এই প্রথম এসেছি। এর আগে এ কথা আমি কখনও ভাবিওনি।'
‘তাই বুঝি!’ হাজার সরিয়ে নিয়ে পদসিবলো। চেয়ারের পেছে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন।

ঢুকনেই কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চুপ। চারদিক নিষ্ক্রিয় নিখুঁত।

‘হ’, তাহলে এই জন্যে আপনি এখানে এসেছেন। কিন্তু আপনার কথাটা যদি সত্যি বললে ধরে নিই, তাহলে সত্যিই ঢুঁকজনকং মানে, আমি বুঝতেই পাবি না। আপনার পক্ষে কেমন করে তা সম্ভব। আর যদি সত্যি না হয়...’

অভিজ্ঞ ঝামু পুলিস কর্মচারীর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া আজ সহজ নয়। মুখে কীকার না করলেও উনি জানেন মেয়েটির প্রতিটা কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। যদিও এই ধরনের ব্যবসায় পক্ষে মেয়েটি এককাল্যাণ অনন্য, তবুও চোখে মুখে বেশ্যাদের পরিচিতি অভিবাদনের কোন চিহ্নই তিনি খুঁজে পেলেন না।

‘বিশ্বাস করুন, আমি একটিও মিথ্যা বললি না।’ মুখরে কথাটা। বললেও তরুণীর কণ্ঠে ফুটে উঠলো প্রশ্নর অঞ্চলপত্তায়। ‘তাছাড়া এমন জন্য কাজে যখন একবার নামবার মনস্ত করেছি, তখন আর মিথ্যা বলে কি লাভ বলুন? সত্যি, বিশ্বাস করুন—স্বার্থ অর্থ উপার্জনের জন্যেই আমি এখানে এসেছি। আমার বাবী ছিলেন কীমার-চালক, গত সীতার শেষে তুষার-ভাঙনের সময় ডুবে মারা যান। আমার হুটে বাছা। একটা ন বছরের ছেলে, ছোট মেয়েটার বয়স সাত বছর। হাতের একটাও পয়সা নেই, না কোন আল্পীয়ত্বন। চেলে-বেলায় আমি মাটি হয়েছি একট। অনাথ-আশ্রমে। বাবীর আল্পীয়ত্বন থাকেন অনেক দুরে। তাছাড়া তারা সবাই অবস্থাপন্ন, আমাকে তেমন পছন্দ করেন না। কার ওপর নির্ভর করেন। বলুন। কাজ করে অবশ্য রোজগার করতে পারি। কিন্তু যা রোজগার করি তার চাইতে আমার অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন। ছেলেটো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়েছে। লেখালেখি করলে হয়তো। ওর মাইন্টে মুক্ত করতে পারে, কিন্তু আমার মতো গরিব বিধবার দিকে নজর দেখার ওর সময় কোথায়? অথচ এ তুষার সুন্দর মাথা, ব্যবসায় থেকে ছাড়িয়ে নিতে মন সরে না। ছোট মেয়েটাও পড়াশোনা করে। ওর মানুষ যাদের তাই কিনে দিতে হবে। কাজ করে আর কত রোজগার হবে বলুন। সারা মাস কাওরা বাড়িতে রাধুনিয়ের কাজ করলে হয়তো পুঁচ করল পাবে। ওতে আমার কিছুই হবে না। অথচ এ কাজে ভাগা সুন্দর হলে কোন মেয়ে এক বাছিরেই সার। বছরের সংসার খাঁচার ঠাকুর উপার্জন করতে পারে। আমার পরিচিত একটি মেয়ে তো গত বাবার মেলায় চারিশে। কবর...
গফিকের শেষট্ট গল্প

রাখার করেছিলো। ওই টাক। দিয়ে ও একজন বনরক্ষককে বিয়েই করে ফেললে। এখন ও পুরোদমের ভর্মহিলার মতে। জীবন যাপন করছে। আপিনি হয়তো বলবেন এ কাজ জন্যা। কিছু আপনিই বলুন, না বেঁধে পেয়ে মরাট।
কি এই চাহিদেও জন্যা নয়?

পদসিপলে। তরলের প্রবৃত্তি শক্ত এই করে গিলছিলেন, এবার মনে মনে অনন্য অনন্দ করলেন। ‘দেখো, এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না বলে সত্যই দুঃখিত। আপনি বরং স্বাস্থ্য-দুঃখের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং পুলিস-প্রধানকে লিখুন, ওরা আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।’

তরলে আর অপেক্ষা করলেন। না, চেয়ারে চেঁদে উঠে পড়লেন। তারপর চোটকে একটা অভিবাদন জানিয়ে ধীরে ধীরে দরজার দিক এগিয়ে গেলেন।
পদসিপলে। চোটকে চোটকে অনেকক্ষণ ধরে একটুটু ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। কি যেন একটা ওর মেঝের মধ্যে কীটাক মাটু বিঢ়িলেন।

দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে তরলে হঠাৎ ঘুরে ঘুরিয়ে গেলে। সমুদ্র-নীলে আরম্ভ চোপেটেই চরিয়ে দিয়ে শাক্তায় তিজেস করলেন, ‘এখন তাইলে কি পুলিস-প্রধানের সঙ্গেই দেখাকে করবে।’

‘কন্না।’

‘অসংখ্য বল্যাবাদ। বিদায়। তরলে চলে গেলেন।’

টেবিলের ওপর কেঁদে রেখে পদসিপলে। গাছে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর গভীর একটা দীর্ঘস্পষ্ট ফেললেন। ‘না, মেয়েটা ভারি
অচুততে।’

‘আমাকে ডাকছেন, স্বারা?’ আগের প্রহরাটিকে আবার দরজার সামনে
দেখা গেলে।

‘কি?’

‘আমাকে কি আপনি ডাকলেন, স্বারা?’

‘বরি যাও।’

‘দেখো খাও।’

‘গড়ম্বার পদসিপলে জানলার দিকে তাকিয়ে দেখলেন কুঠিরের তখনও
অকাঠামু ঘুমছে। সত্যিই প্রহরী ওকে জাগিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছে।
কিন্তু এখন ওর রাগ জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। নিম্নাঙ্গ মারুনের দৃশ্যে ওঠে
নীল-নয়ন

আর উত্তাক্তি করতে পারলে না। উনি এখন মানসিকে দেখছেন মেয়েটার
সমুদ্র-নীল আঁকত ছুটে। চোখ, অপলক স্বরূপতেই ওর দিকে তাকিয়ে আছে,
আর উনি মনে মনে কেমন যেন একটি অর্থন্ত অনুভব করছেন।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই উনি লাফিয়ে উঠলেন। কোমরবন্ধ। শুক করে
এটি অকিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। মনে মনে বিড়বিড় করে বললেন, ‘আমি
জানি, ওর সঙ্গে কোথাও না কোথাও দেখা আমার হবেই।’

ছুই

এবং হলো তাই।

সেদিন সংযোগের মেলার প্রধান-দপ্তরের সামনে উনি বাড়িয়ে রয়েছেন,
দেখলেন মেয়েটি ধীরে পায়ে পার্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নীলের চোখের পাতাখুটি।
হিয়, পোড়া সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। অনন্য দীর্ঘল ওর নিটোল
দেহ-ভক্ষণ, ওর ছদ্মল ইটায়, ওর তন্ময় চোখের অভিজ্ঞতাই কি যেন
একটি আভিজ্ঞতা, একটি অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা। কেবলমাত্র এ আর
মাঝে, সুন্দর রাশিয়া মুখখানা ঘিরে জড়িয়ে রয়েছে বান একটা বিষন্ত, যা
প্রথম দিনে উনি দেখেছিলেন।

পদসিবলা। ধীরে ধীরে গোরের প্রান্তে মোচড় দিলেন, মনে মনে তাবলেন
বাপাট। একটু তলিয়ে দেখে হবে।

‘এই যে, শুনছেন,’ গেছে থেকে উনি ভাবলেন। ‘হ্যা, আপনাকেই
বলছি।’

মিনতি পাঁচোর পরে হুজনকে পাশাপাশি বসে ধাকতে দেখা গেলো পার্কের
নিকিন্তে একটা বেঁধিয়তে।

মুচকি হেসে পদসিবলা জিগস করলেন, ‘কি, চিনতে পারছেন?’

‘হ্যা।’ তরী মান চোখের পাতা তুলে তাকিয়ে। ‘তারপর, কেমন
আছেন?’

‘তাতো। আপনি? কার্ড পেয়েছেন?’

‘হ্যা।’ তরী পকেট থেকে কার্ড বের করে দেখালো। ‘এই যে।’

পদসিবলা মনে মনে বিস্মিত বোধ করলেন। ‘না, দেখুন...আমি
আপনাকে অবিশ্বাস করিনি। এমনি জিগস করছিলাম। তারপর রোজগার-
গাঁকির শেষ গল্প

পাতি কেমন হচ্ছে? এখানে করার সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন বুকের ভেতর থেকে ওকে সতর্ক করে দিলে—কি দরকার পদসিবলো, মিছিলিকি পুরনো। কাসুনি বেঁটে কি লাভ!

‘রোজগারগাতি?’ চেরি ফলের মতো। রাতি হয়ে উঠলে। তরুণীর ছুড়ি চিন্বক। ‘মন্দ নয়।’

‘বাবা, শুনে খুব খুশি হলাম। নিন্দিয়েই ছাড়িতে কিছুটা। সুরাহা হবে, তাই কি না বলুন?’

তরুণী ওই দিকে বুঝে এলে। মুখখানা বিরাজ সংকুচিত, যেন এখনই অর্থ কাশ্মীর পড়তে পড়ে। কিন্তু চকিতে ও আবার নিজেকে সরিয়ে নিলে। তারপর আগের সেই হৃদয় ভঙ্গিতে পোঁজ। হয়ে বসলে। ‘ইঠা, কিছুটা হবে বৈকি।’

ওর সামন্দি, ওর নিশ্চল উপস্থিতি, ওর স্বচ্ছ কঠিনর, ওর অলকর নীল চাওর দৃষ্টিতে পদসিবলোর গাত। হঠাৎ কেমন মনে গলিয়ে উঠলে। এতে চিহ্নিতে ফেটে পড়ি আগেই উনি উঠে পড়লেন। তারপর নিঃশব্দে হাতটি বাড়িয়ে দিলেন।

তরুণী অচম্পচম্পে বললে, ‘বিদায়।’

সামায় একটু মাথা হেঁটে বলিশ পায়ে উনি এগিয়ে গেলেন। নিজেকে এখন ওই কেমন যেন বুক। বুক। মনে হচ্ছে, আর তাঁর জন্য উনি মনে মনে নিজেকেই অভিসম্পত্তি দিলেন। ‘ঠিক আছে, সুদরী! আর করেকটা দিন অপেক্ষা করে, তখন বুঝতে পারবে আমি একটা কি চিহ্ন। তখন আর তোমার উচু যোঁড়া থেকে নেমে আসতে তব সৈবে না।’ আপন মনে বিদ্বিন্দ করলেও, উনি ভালে। ভাবেই জানেন ওকে এগিয়ে তার মতো। এখনও পর্যন্ত কোন অন্যায় ও করেনি।

এবং স্বত্ব সেইজনেই মনে মনে উনি আরও কুঁড়া হয়ে উঠলেন।

তিন

সেই সম্পূর্ণ করেকিন পরে সঙ্ক্ষেপে পদসিবলো মরুপাশ্চাল। থেকে বেরিরে সাইবেরিয়ান জেটাগাটের দিকে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ টুমোরের শাক শুনে থমকে হোঁড়ানলে। মেয়েলি কেঁদে তীক্ত। চিখাকুর আর অঙ্গায়া গালাগালি ভেসে আসছে পাশ্চালার ভেতর থেকে।
‘বীচাও! বীচাও! পুলিস!’ আতঙ্কিত একটি মেয়েলি কঠিন। তার সঙ্গে উনি গুলোলন ধন্যতাপতি আর চেয়ার টেবিল উলটানোর আওয়াজ। অন্য শন্দের সঙ্গে ভেঙে আসছে তারি একটি পুরুষ কঠিন। অমৃত উৎসাহে গলাট চড়ে উঠলো। ‘লাগাও, লাগাও! আচ্ছাদে লাগাও ওর নাকে!’

সহকারী পুলিস অফিসার পর্ব ফি-মারি করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলেন, দরজার সামনে ঢোঁড়ানে। কুতুহলী জনতার ভিড় ঠেলে কোনরকমে ভেতরে এবং করে দেখলেন তার পরিচিত সেই নীল-ছোঁয়া তরুণী। টেবিলের সামনে ছুঁকে বাং হাতে অন্য একটি মেয়ের চুলের মুঠি ধরে ভান হাতে ওর মুখে নির্মিতভাবে খুশি মারছে।

তরুণীর নীল ছোঁয়া ছুঁকে ছোট হয়ে গেছে, ঠোঁটছোট সুসংলগ্ন। গাড়ির ছুঁকে দারা। ঠোঁটের কোলে থেকে নেমে এসেছে চিবুক নেমে, আর ওর সুন্দর মুখখান। হিংস্ত পান্ত্রু কৃষ্ণতার এখন দেখাচ্ছে নির্মাণ, নিখিল।

অন্য মেয়েটি প্রতিবাদে আরামে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে অদ্‌হুদ একটি শব্দ করেছে আর শুনে। তো হাত ছুলে নিয়ে বাঁচানি ভেস্ত। করছে। এই দেখে পদিসিলের মাধ্যমে রক্ত চড়ে উঠলো, অথবা ঈশ্চে হলো। কারও ওপর প্রতিশোধ নিতে। ফুটে ছুটে এসে উনি তরুণীর কোমর জড়িয়ে টেনে সরিয়ে আনলেন।

আকড়ে ধরতে গিয়ে টেবিলটা উলটে গেলো। চীনামাটির পাত্রগুলো মেরেতে আছড়ে পড়ে ঝনকন শব্দে ভেঙে গেলো। ভিড় করে ঢাঁড়ানো জনতা উদ্ভির্জ হাসিতে ফেটে পড়ছে।

উদ্ভির্জ ক্রোধে উনি হাসিতে-বিকি লাল মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। ‘বাছা, এখানে নাটক তো বেশ জেনে উঠছে দেখছি!’

নীল-ছোঁয়া তরুণীর হাতের শিকার তখন তাঙা কাঁচের টুকরোর মধ্যে গুঁজে হাত পা ফুটছে আর মুখীরেরোয়ার মতো বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

লম্বা নীল কোট-পরা বেঁটে বড়ুড়ুড়ু একটা লোক পদিসিলেরকে সমস্ত ঘটানটা বুঝিয়ে বললো, ‘ওই মেয়েটা একে বললো—ফুই জেনাল, ফুই একটা বেশা। এ তখন ওকে প্রথম চড় মারলো। আর ওই মেয়েটা। এর গায়ে এক গেলাস চা ঢেলে দিলো। তারপরেই এ ওর চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে খুশির পর খুশি লাগলো। গায়ের জোরে এর সঙ্গে ও পারবে কেন…”

‘হ’, সে তো। দেখতেই পাচ্ছি।’ চাপা গর্হণ করে উঠলেন পদিসিলো। হু
গার্কির শেষ গল্প

হাতের মধ্যে প্রাচুর্য রাগে ফুলে ফুলে ওঠা তরুণীর বাঁধাটে। শরুর করে চেপে ধরলেন। এমন সময় লম্বা চওড়া বলিংক একজন পুলিস-প্রহরীকে প্রবেশ করতে দেখে ওঠে লেঘাল, ‘একে ধামায় নিয়ে যাও, ইত্যাদি।’ এদের হংসনকেই নিয়ে যাও।’

ওদের হংসনকে নিয়ে যাবার পর পদসিবলো। পরিচারককে ছুকুম দিলেন, ‘শিগগির এক বোতল কোডার আর সোভা নিয়ে এসে।’ তারপর উনি জানলার ধারের একটা চেয়ারে জাঁকিয়ে বসলেন। এখন ভোর নিজেকে কোমন যেন কাঠামো মনে হচ্ছে।

পরের দিন ভোরে প্রথম দিনের মতো। শান্ত স্বন্দর অগ্রাধিত তরুণী পদসিব-লোর সামনে এসে দাঁড়ালে। অতল নীল চোখছুটে মেলে দিয়ে ও অপেক্ষা করে রইলে। মনে মনে চাইলে। সহকারী পুলিস কর্মচারীর প্রথম কথা বলুক।

রাতের যথেষ্ট ভালো ঘুম না হওয়ার পদসিবলোর মেজাজটো। এমনিতেই আগে থেকে বিগড়ে ছিল। এখন রাগে রাগে টেবিলের কাগজপত্র হবে একপাশে ছুড়ে ফেলে দিলেন। তবু কি বলবো কিছু ভেবে পেলেন না। আসলে বিশেষশৃঙ্খল বেশ কিছু কড়া কড়া কথা শোনার ইচ্ছা ছিলো।

‘অমনই করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, কথা বলুন। প্রথম কি করে শুরু হলো?’

‘ও আমাকে অসমান করেছিলো।’

‘তাই নাকি?’ বিশ্বাস তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। পদসিবলোর কঠোর।

‘নিচেই। আমাকে এভাবে অপমান করার ওর কোন অধিকারই নেই। আমি ওর সমানু নই।’

‘তা কিছুর বুলা। আপনি নিজেকে ভাবেন?’

‘প্রয়োজনের জন্যে আমি এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। অথচ ও⋯⋯’

‘অথচ ও নিজের দেহের প্রয়োজনে এ কাজ করছে, কি, তাই তে।?’

‘আপনি কি ওর কথা বলছেন?’

‘হ্যা, ওর কথাই বলছি।’

‘ও তে। একটা বাঁধা মেয়েমামুখ, ওর কোন বাঁধাই নেই।’

‘দাঁড়ি থাক, ঘুম হয়েছে। এরার টুপু করুন। আপনি কি ভাবেন আপনার বাঁধাদের ঘুমে আমি জল খাবে। ঘুমুন, এবারের মতো।’ আমি আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু এর পরে ফের যদি আর কখনও কোন গুগোলি করেন,
চক্ষুশ ঘটার মধ্যে আমি আপনাকে শহর থেকে ঘাড়ধাকা দিয়ে বার করে দিতে বাধ্য হবে। তখন আর মেয়ান রোঝগার করে খেতে হবে না। আমি আপনার মতো নোংরা চরিত্রের মেয়েদের চিনি, বুঝলেন?

কৃত্রিম অপমানকর শব্দগুলো। এখন অনায়াসে ওঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। আর তরুণীর সারা মুখ বিবর্ণ পাংশুল হয়ে উঠলে। গত রাতের মতো নীল চোখখুঠো ওর কুঁচকে ছোট হয়ে গেছে।

‘বেরিয়ে যান এখান থেকে।’ টেবিলের ওপর প্রচুর জোরে যুথিষ্ঠ মেরে পদসিবলো চিংকার করে উঠলেন।

‘ঠিক আছে, ভগবান একদিন আপনার বিচার করবেন।’ শুকনো গলায় কথা বলে তরুণী ভ্যুম ঘর চেড়ে বেরিয়ে গেলে।

‘দেখো কে কার বিচার করে।’ চিংকার করে পদসিবলো জ্বাবটা ছুঁড়ে দিলেন। শুনি অপমান করতে গেলে এখন মনে মনে বেশ তৃপ্তি পাচ্ছেন। ওর প্রশংসা মুখ, আরো নীল চোখের স্বর দৃঢ় তুলে কেমন যেন ক্ষীণ করে তোলে। নিজেকে ও কি তাবে কি? মনি? ত্রিভুবনীতি? নিজের বাহ্য। আছে বলে? তারি বয়েই গেলে। সাধারণ একটা রাস্তার মেড্যামামলা, ভাবমুর্শা চাল সেই চুলো। নেই মেলায় এসেছে ছুঁটে পায়স। রোঝগার করতে অসল উদ্দেশ্য কি কে জানে। কৃষীর সাধনা বাচ্ছাদের মায়ের মতো, না। কারণ ঘাড় তাহবে। বেশাকে বেশা বলে সীকার করার যার সাহস নেই, কেবল আলোকে দৌষ দেয়...যত সব।

চার

ফুলের জীবন পোশাক-পার। ছুটে বাছু। বলে রয়েছে কাসিন কটিভাটের একটা বেঝিতে। শরতের হিমেল হাওয়ায় ঠাককল করে কাপছে। ছেলেটার মাধ্যম কালো। কূলাল বাঁধা, মেয়েটার গায়ে পশমের কোট। কোটটা ওর ছোট শরীরের তুলনায় অনেক বড় আর চলচল। ছুঁষ পাশাপাশি বলে নিচু গলায় কি যেন গলা করছে। মা হাড়িয়ে রয়েছে ওদের ঠিক পাশে ধাক-ধাক-করে-রাখে। একারশ বস্তার গায়ে হেলান দিয়ে। যেহেতু। ভগবান নীল চোখখুঠো অপলক তাকিয়ে রয়েছে বাচ্ছা ছুঁটের দিকে।

ছোট ছেলেটাকে দেখতে ঠিক ওর মার মতো। নীল চোখখুঠো মেলে।
দিয়ে মুহুর্তে হেসে হেসে তার ছোট বোনকে কি যেন বলছে। বাচ্ছা মেয়েটার মুখে বসমের দাগ, ছোট তীক্ষ নাক, হালকা-ধূসর দীপক চোখাটো আচর্চ উজ্জ্বল আর জীবন। ওদের আশেপাশে তাদের ওপর রাখা প্রাপ্তির মালাশর।

শরতের শেষ। সারাদিন বিরিজির রক্তি পড়ছে। ভলাগর কানায় কানায় বেহ চলেছে যেলা। জলের প্রতি, কুচু আক্রোশে আচ্ছাদে পড়ছে তীরে। সাতচৌতে ভিজে হাওয়া। উড়িয়ে নিয়ে চলেছে তাদের চাপ। গর্জন। নানান ধরনের মানুষের রুপ যায়। আসা করছে, চোখে মুখে উদ্বিগ্নের ছাপ। আর কিছুদিনের মধ্যেই সীমারটাকো জেটিয়াট ছেড়ে ভলাগর পাড়ি দেবে।

দূর থেকে ওদের তিনজনকে দেখে পদসিবলো প্রথমে থমকে লাভিয়ে পড়েছিলেন, এবার ভালো। করে লক্ষ্য করার জন্যে সামনে এগিয়ে এলেন। কেন জানি মনে মনে উনি কিছুটা লজ্জিতও হলেন।

সীমার ঘাটে এসে লাগার আগেই লোকজন জেটির ওপর ভিড় করতে শুরু করছে।

তরুণী তার তলিতলা তুলে নিলো। বাচ্ছাটোতাও তাদের পিঠে ছোট ছুটে পুঁটলি নিয়ে মার পেছন পেছন টিকিট-ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো।

পদসিবলোর ইচ্ছে ছিলো। জেটির ওপর গিয়ে লাড়ার, তাছাড়া ভিড় সামলানোর আরোহনও ছিলো। কিন্তু পালিয়ে না। টিকিট-ঘরের অন্তরে লাড়িয়ে অপেক্ষা করলেন।

তরুণী টিকিট-ঘরের সামনে এসে লাড়ালো। হাতে ওর টাকাপয়লা রাখার ছোট একটা ব্যাগ, একগাদা পাকানো নোটে ঠাসা। 'এই বাচ্ছাটোর জন্যে কর্তৃপক্ষ হুটো দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট দিন না। আর আমার জন্যে একটা তৃতীয় শ্রেণীর। কিন্তু অমুখুহ করে বাচ্ছাটোর জন্যে একটা টিকিটের দাম নেবেন। কি বললেন? বাতিক্রম। হী, ছোটে। বটেই। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

তরুণীর সারা মুখ পুকিয়ে ঝলমল করছে। তলিতলা। তুলে নিয়ে ও ফেরিঘাটের দিকে এগিয়ে গেলো। বাচ্ছাটো। এরার চু পাশ থেকে মার ঘাঁটর গ্রামে শম্ভু মুঁটার আক্রোশ ধরে হঠতে। ছোট মেয়েটা মুখে উচ্ছ করে মাকে কি যেন বললে। জুনি জুটো টিপে হাসলো। 'হী, হী! কিনে দেবো বলেছি তো, বললো? না কি চরেছো? কখনও কিনে দিনি? হুঁসেই দিতে হবে। ঠিক আছে। এখানে চূপটি করে লাড়ারও, আমি একখুব আসি।'

ফেরিঘাটের মুখে সারি সারি দোকানগুলোর দিকে ও এগিয়ে গেলো।
একটু পরেই ও আবার ফিরে এলে। ‘এই নাও, তোমার জন্য গায়ে মাথার সাবান। কি সুদর গন্ধ একবার শুক্ল ছাদে। আর তোমার জন্য এই পেনসিল কাটার চুরি। ছাদে। আমি কিছু তুললিনি। আর তোমাদের জন্য এই এক ডজন কমলা। দেখো, যেন আবার একবারেই খেরে ফেলো না।’

এবার স্ত্রীমার এদে জেটির গায়ে লাগলে। হঠাৎ ধাক্কায় অনেকে ভার-সাম্য হারিয়ে ফেললে। মা বাছাছাঁড়াকে আঁকড়ে ধরে বিস্ফোরিত চোখে চারপাশে দৃষ্টি রোলালো। কিন্তু ভয়ের কোন কারণ না দেখে হেসে ফেললেন। বাছাটাই থিলথিল করে হেসে উঠলে। সিংড়ি। নামিয়ে দেওয়া হলো। বাতার। পিলপিল করে ওপরে উঠতে শুরু করেছে।

‘আস্তে আস্তে উঠোন, আস্তে আস্তে! এত ঠেলাঠেলি করবেন না!’ জেটির মুখে ঠাড়িয়ে পদতলে। তখন ভিড় সামলাতে হিস্সা খেয়ে যাচ্ছেন। ‘এই যে মাথা-মোটাট। হা। হা, তোমাকে বলছি।’ পিটে ভোলালেনা করাত, বাটালি, তুরপুকো ও অন্যান্য মরার সময় একজন চুঁটের মিল্লি দিয়ে তাকিয়ে পদতলে। হঠাৎ চেঁচে উঠলেন। ‘চোখে দেখতে পাও না? সরো সরো, বাছা আর মেয়েদের আগে যেতে যাও। আর এসব ধারালো। মরার সন্ত্রপাতি নিয়ে একটু সাবধানে চলাচল করবো তো?’

পরিচিত মহিলা আর বাছাছাঁড়াকে জেটির মুখ অতিক্রম করতে দেখে পদতলের গলায় ঘর নিচু খাদে নেমে গেলো। তরুণী আয়ত। নীল চোখ-ছুটি। মেলে দিয়ে মিঠি করে হাসলে।

তৃতীয় বাঁশি পড়লে।

সারে সিংড়ি তুলে নেওয়ায় আদেশ দিলো।

স্ত্রীমার এবার একটু একটু করে জেটি ছাড়তে শুরু করেছে। রেলিংর সামনে ঠাড়নো। ভিড়ের মধ্যে পদতলে। পরিচিত মুখ্যতাকে বোঝার চেষ্টা করলেন। যখন খুঁজে পেলেন, মাথা থেকে টিপি খুলে হাত নাড়লেন। তরুণী বুকের ওপর অভাব হাত রেখে সামায়া একটু বুক অতিবাদন করালে।

মা আর বাছাছাঁড়াকে এভাবে কৃত্রিমার পথে পাড়ি দিয়ে দেখে সহকারী পুলিস কর্মচারী, পদতলে। হঠাৎ কেন জানি না তীরের একটা দীর্ঘকাশ ফেললেন।

ফিরে আসার পথে নিজেকে ওঠে বিশ্ব আর ভীষণ অসুখী মনে হলো।

১৮৯৫
কবি

ফুল থেকে ফিরে এসে সূর। কোটটা গলে ফেললো। রামানুজের গ্রেবশ করে মামলিকে খাবার টেবিলের সামনে রেখে মুচকি মুচকি হাসতে দেখে ও কেনন যেন কুচকুলি হয়ে উঠলো। কিছু ক্ষণ করে কূলোল নির্মঃ করাটাকে ওর অশোভন মনে হলো। কেননা। ও এখন বড় হয়ে গেছে। তাই মামলির কপালে নিঃশব্দে একটা চুমু দিয়ে আরামায় নিজেকে একবার দেখে নিলো। তারপর চেয়ারটা টেনে নিয়ে ফেললো। কিন্তু আর একবার কুচকুলি না হয়ে পারলো না। দেখলো টেবিলটা পাঁচজনের জন্য সুদর করে সাজানো হয়েছে। নিঃশব্দে নীচে ভোজের জন্য কাউকে নিমিত্তে করা হয়েছে। সুর। ঘরে হতাশ হয়ে দীর্ঘায়ান ফেললো। বাপি। মামলি আর জিন। জেটির উপস্থিতি ও অমূল্য করতে পারলো। কিন্তু এদের তিনজনের মধ্যে কারবার সঙ্গে তেমন জমিয়ে গল্প করা যায় না। ভীষণ একপ্রায়! তাই নিজেকে প্রচুর রেখে সাভারিক ঘরে ও জিগেস করলো, ’কে আসছে, মামলি?’

উভয় দেবার আগে মামলি ওর মুখের দিকে তাকালেন, তারপর ঘড়ির দিকে দৃষ্টি ফেললেন। তারপর আবার খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করলেন। শেষে ঠোট টিপে মুচকি মুচকি হাসলেন। ’নান্দো করু।’

’ঠাটটা করছে তো?’ সূর। অনুমান করতে পারলো ওর কুচকুলি এখন তীব্র হয়ে উঠছে। মনে পড়লো। রামানুজের আসার আগে বাড়ির পরিচারিকা লিউ। দরজার সামনে ওকে বলেছিলো, ’ওমা, আপনি এসে পড়ছেন, দিদিরি।’ এর আগে ফুল থেকে ফিরে আসতে দেখে লিউ। কোনদিন এত ধূসি বা অবাক কোনটাই হয়নি। এখন ও স্পষ্ট বুঝতে পারলো, ছোট-বৃদ্ধ একত্রে পরিবারের জীবন-তরঙ্গে কোথায় যেন একট। নতুনভে সূর বাজছে। কিন্তু আসল রহস্যটা ওর ছোট মাথায় কিছুতেই প্রবেশ করলা না।

’ও মা, ঠাটটা করবো কেন?’ মামলি আবার মুচকি মুচকি হাসলেন। ’তুই নিজে থেকে একটু অন্দরার করার চেষ্টা করু।’

সূর। সাভারিক হবার তার করলো। ’নিষ্কাশির কোথা থেকে কেউ আসছেন!’

’সে তো। বটেই। কিন্তু কে?’

চিবকের পাশছটা সূরার রক্তিম হয়ে উঠলো। ’নিষ্কাশি ঝেনা-কাকু।’
‘না না, আমার বিশ্বাসকে কেউ নয়। কিন্তু এমন কেউ, যাকে দেখার জন্যে তুই পাগল।’

সুরা চোখ বড় বড় করে তাকালো। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে মামলিকে জড়িয়ে ধরলে। ‘সত্যি, মামলি?’

‘থাক, আর আদিবেক্তি করতে হবে না! খুব হয়েছে!’ মামলি হাসতে হাসতে ওকে ঠোল সরিয়ে দিলেন। ‘হুর্তু মেয়ে কোথায় রাডা না, উনি আগে আসুন, আমি ঠিক বলে দেবো।’

‘সত্যি মামলি, কিম্পিকি কি আসছেন? বাপি ওকে আনতে গেলেন? আর জিনি-জোটি? ওঁরা তো তাহলে যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন! আমি তাহলে সবচেয়ে ভালো করে পড়া চাই। ওঁরা আসছেন...ইসু, কি মজা!’

আলুন্দ-উত্তেজনার চোটে সুরা মামলির চোখের চারপাশে এক চোখের ঘুরেই নিলো। তারপর ছুটে এসে রাড়ালো আনন্দীর সামনে। যখন পোশাক পালটাবার জড়ে ও বেরিয়ে যাছিলো, সিঁড়ির নিচে থেকে শুনলো। সদর-দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। সুরা আবার আনন্দীর সামনে রাড়িয়ে বৃত্ত হাতে টুলটুলি। ঠিক করে নিলো। তারপর চোখের ফিরে এসে ছোটের পাতা। বদ্ধ করে শক্ত হয়ে বসে রইলো; যাতে ভেতরের চাপা উত্তেজনাটাকেও কোন রকম সামলে নিতে পারে। যখন চোখের পাতা। মেলবে, দেখে কিম্পিকি ঠিক তার সামনে একটা মাছ চোখের ওপাশে এসে রাড়িয়েছেন। কিম্পিকির কবিতা ও বর্ণবার পড়েছে এবং শুলের সবার কাছে উনি সর্বশেষ আধুনিক কবি। উনি এমন সুর্দর, এমন করণেশ, এমন আচর্চ্ছি ধনি-মুরি মিটি কবিতা লেখেন, উঃ ভাবতেও অন্যান্য লাগে। সেই তিনি ববশীরে এখানে। আসতেন, তার সামনে রাডালো, তার সঙ্গে কথা বলবেন, নতুন নতুন কবিতা পড়ে শোনাবেন। সত্যি, ভাবতেও গায়ের মধ্যে শিরশার করে। কাল বেশ শুলের মেয়েদের কাছে ও বলতে পারবে, ‘কিম্পিকি নতুন কি কবিতা লিখেছেন আজনি?’ ‘এই, কি লিখেছেন, বদ্ধ না রে!’ মেয়েরা সবাই ওকে ছেড়ে ধরলে, আর নতুন একটা কবিতা আরম্ভ করে ওদের সঙ্গে শোনাবে। সবাই ওকে কিজন্তাকাক করবে, ‘এই সুরা, ‘কবিতাটা কোথায় পেলি রে?’ ও তখন উদাস করে ঠোঁট উলটে বলবে, ‘কবিতাটা এখনও চাপাই হয়নি। কাল আমাদের নৈস্তব্ধের আসরে কিম্পিকি তুই নিজে পড়ে শুনিয়েছেন।’

সবাই তখন ওকে যা হিংস করার না! বিশেষ করে কিন্তু কুটনীটী, ও
গিরির শেঠ গল্প

তে। হিসেবেই অলে-পুড়ে মরে যাবে! বিধাতা কোন কবিতা পরিচিতি, চাইতে পারবি। এই সুরা, বে। এ না। আমাদের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে। আছে, তো কবি! কবি। যখন-তখন প্রেমে পড়েন। আছে, ওর কৌফ-কোড়াটী। কোমনা দেখতে হবে? আর চোখচুটি। নিশ্চয়ই খুব বড় বড় আর করণ, মন্দিরটি কুচুচুচে কালো। কাকানা নাক। কৌফকোড়াটি নিশ্চয় কালোই হবে। শান্ত হয়ে ওনি বলবেন, 'সুরা! সুরা তোমাকে দেখার পর থেকেই 'সীমনের নব নিশ্চিন্তিকায়। আমার উচ্চল আবিল হলো, প্রশিক্ষিত হয়ে উঠলো হয়ে, আশায়...তুমি অনন্ন, প্রতিমা আমার, ধননীর প্রতিমা রক্ষারতে তোমাতে আমাতে চেনাঃ।' কিন্তু এ তে ওনি আগেই কবিতাতে লিখেছেন।

তাহলে...

'আর বলবেন না, যেমন খুলো তেমনি গুদা। বিপ্লব হাস্যে রাতিরে যুথত পাইন না।'

বিয়ের বন্ধারের ভরাটে একটি কঠোরে সুরা যেন তার সুরিল বতনি মনোলক থেকে ফিরে এলো বান্তবে। চোখ মেলে দেখতে তারা মন্দলের বহির্বাস, ধূসর রঙের পায়াজমা-পরা লম্বা রোগ। মতন এক ভূমলোক তার দিকে এগিয়ে আসছেন।

'গুলোকন, তরলী। নিশ্চয়ই তুমি আমাকে হুলে গাছে। কি, তাই না?'

'আমি?' হঠাৎ সুরা সবচেয়ে কেমন গুলোকে ফেললো। 'না না, আমি সব সময় অপার কবিতা পড়ি। তবে শেষের পাঠগী যখন এখানে এসেছিলেন, আমি তখন খুব চোট ছিলাম।'

চোখের দৃষ্টিতে সর্বসাধারণ জরিপ করে নিয়ে কবি মৃদুকী মৃদুকী হনলেন।

'আর এখন তো তুমি রীতিমতো। মহিলা। হয়ে গাছে।' আর কি যেন বলতে গিয়েও বললেন না। রুক্ষার মতে। ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে চেপে তোলে নিয়ে বললেন। তারপর বাপির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের এ জায়গাটি কিন্তু তারি চমৎকার, মিথাইল।'

সুরা তার চোখে পাতা নামিয়ে নিলে টেবিলের উপর। ওর ধূসর রঙের পায়াজমা, কদম-ছাঁটা হুল, ওর পায়ালা লালচে কৌফকোড়াটি। সুরার পছন্দ হলো না। মনে হলো। ওর সবচেয়ে কেমন যেন নিহত গল্পমর! এমন কি সত্য-কামানো। ওর লালচে চিত্রক, সব ধূতনি, ঠোঁট চাপার ভড়মিটাও। বিবর্ণ বছর
চোষ পাতার নিচে মাংসল কয়েকটা উজ্জল। কপালে বলিয়েছে। ঠিক যেমন ডাকরে দেখা কোন কোন পার্শ্বিতে কোথায় কোন দ্বায় ময়টার চিহ্ন নেই। সুর। আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো সুর শীর্ষ আঙুলে একটা পেঁথার্ষের আংটি। বুকের অতল থেকে ওর বেঁচে এলো। করণ গতীর একটা দীর্ঘশাস।

‘তাহলে তুমি আমার কবিতা পড়ো?’

গোলাঙ্গের ঝাঁপা পাপড়ির মতো রাঙ। হয়ে উঠলো সুরার চুবকুছটা। সুর নিশ্চিন্ত মাথা নাড়ল।

‘বাং! একটা কথা জিগেস করবো? আচ্ছা, আমার কবিতা তোমার কেমন লাগে?’

‘আর বলবেন না,’ মামলি জবার দিলেন। ‘আপনার কবিতা নিয়ে ওর সবাই পাগল।’

‘এটা কিছু অতিরেক।’ কবি মুচ্ছি মুছি হাসলেন।

‘না, মোটেই তা নয়।’ সুরা চাপা ঘরে মামলির কথার অতিরিক্ত করলে।

কিন্তু তাইরির কান এডিয়ে গেলো না।

লক্ষ্য রাঙা হয়ে উঠলো মেয়ের সাথা মুখ। বাপি, মামলি, ওঁর—সবাই হেসে উঠলেন। বাংলা আ, হাসিয়ে বিষ ছর মৃদুটা এখন বিদ্রুপকরের মতো মনে হচ্ছে। কেন উনি অচ্ছে? অমন বেঁকতে তুলেছেন? কেন উনি আর সবাইয়ের সঙ্গে এমন বোকার মতো হাসছেন? উনি তো কবি, র্তনার আরও বেশি শোভন, আরও বেশি সংবেদনশীল হওয়া উচিত ছিলো। তাহলে উনি আর পাঁচজনের মতো। এমন করেছেন কেন? হয়তো। উনি শোভন হবার চেষ্টা করছেন, হয়তো। আর একটু পরে উনি তোর কবিতায় ফিরে যাবেন।

‘তুমি কোনো বিষেীতে পড়ো সুরা?’

‘এবার ফাইনাল পরীক্ষা দেবো।’

কেন উনি আনতে চাইলেন? কেন ওকে সুরা বলে ডাকলেন?

‘কেনু শিক্ষককে তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে? নিশ্চয় ছবি আকার?’

‘না, সাহিত্যের।’

‘ও সাহিত্যের শিক্ষককে তাহলে তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে!’ কেমন যেন আমরকোষ বলতে উনি হাসলেন, টেনে টেনে কথাটা উচ্চারণ করলেন।

সুরার মনে হলো দুঃখেতে কেন ওকে ছিমিত্তি করে দিলো। সারা শরীরে
গবিনর শ্রেষ্ঠ গল্প

অজ্ঞে কোটার আখান। একখানি যেন ছু-চোখ ছেড়ে জল আসবে। কেন তুমি এমন বিদ্রুপ করলেন? নিজেকে কোনরকম সামলেন নিয়ে একপ্রকার ক্ষুধা ও কবির মুখের দিকে তাকালে। আর চোখাটো। তখন ওর অল্প করছে।

প্রথমে স্বেচ্ছিলে। কথা বলতে গেলেই বুঝি নিজেকে হারিয়ে ফেলবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেবিলের নিচে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে রুক্ষকালে ও বললে। ‘কেন, আপনার অবকাশ লাগছে? তুমি কিন্তু আমাদের বিভাগীয়ের সবচেয়ে তালে। শিক্ষক। আমার সবাই ওকে দারুণ ভালোবাসি। যেমন মিঠি কথা বলেন, তেমনিচিন্তামকার পড়ান...আধুনিক সাহিত্যের প্রথম ওর অগোচর পাণ্ডিত্য।...সবচেয়ে বড় কথা, মানুষ হিসেবে তোর ভারি সুন্দর। হাসছেন কেন? আমাদের ক্রীড়া যাকে জিজ্ঞেস করলেন সবাই বলবে...’

বাপি অবাক হলেন। ‘সুরা, আজ তোমার কি হয়েছে বলে তো সোনা।’

‘সন্ত্রাস আমরা ওকে আখান করেছি।’ চাপা সুরে ক্রিমকে বললেন,

‘আমি কিন্তু ক্ষম চাইছি।’

ওর কষ্টের সুরার কাছে আন্তরিকতাবিহীন, কেমন যেন কৃত্রিম বলে মন হলো। মনে হলো এখানে ও অপারেন্টের, ওরে কেউই চায় না। নিজের জন্য ওর নিজেরই কষ্ট হলো। অনুভব করলে। রুক্ষের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিষয়। জমে উঠেছে, নির্দেশ অথচ উন্নত তীব্র একটা বিষয়।

তাহলে কবিরাও আর পাঙ্গাঙ্গের মত। অতি সাধারণ! খাওয়া-দাওয়ার পর সুরা। তার ঘরে জানালার ধারে বলে বাগানে অতি প্রিয় লাইলাক কোপটার দিকে অপলব্ধ দোঁদো তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবলে। এমন নিমেষহারা চোখে ও তাকিয়েছিলেন যেন কোপটাকে এই প্রথম দেখছে।

উনি যদি আর পাঙ্গাঙ্গের মতোই হন, তাহলে বাপি কবিতা লেখেন না কেন? বাপি কি কবির চেয়ে কোন অংশে কম? ঠিক তখনই ওর মনে পড়লো। কবির লেখা বিছিন্ন কয়েকটি পাকী—যেমন আশ্চর্য গতির, তেমনি কবিতা। আর ছুদাময়। খাবার সময় উনি আর একটিও কথা বললেননি। হঠাৎ নতুন কিছু লেখার কথা ভাবছিলেন। অনেকটা সোনিয়া। সাহিত্যের মত। ওরে আশ্চর্য সুন্দর সুন্দর সব কাগজের ফুল তৈরি করতে দেখলে অনেকেই ঐহিয়ার অল্পত। জিজ্ঞেস করলেও গুঁড়ু হাসতে হাসতে বলতে, ‘কেন, খুব লোভ।’

বাগান থেকে সুরা জুনতে বললো বাপি আর ক্রিমকের স্পষ্ট কোথায়।

‘আপনার শেষ কবিতার বইটা কেমন বিক্রি হচ্ছে? ’
'মন নয়। দ্বিতীয় সংস্করণের কথা তার নয়। কিছু সঙ্গে কবিতা যত না ভালোবেসে কেনে, তার চাইতে বেশি কেনে কোনো বলতে পারবু। কোন বই বেরুতে না বেরুতেই জগত সমালোচকগণ। মাঁ চাহে শুরু করে দিল। অবক্ষু বলে। আর লোকেও অমনি কিনতে শুরু করে দিল। অবক্ষু কি জিনিস জানার জন্য। এতে অবশ্য আমাদেরই লাভ।'

ফিনিস্কির কঠিন উপহারের মেত্তা শোনালেও, বাতায়নবতী তরুণী রুকের মধ্যে তা অপমানকর শব্দপুরুষের মেত্তা এতে প্রতিক্রিয়া হলো।

'ইহা,' বাপি বললেন, 'আপনাদের মেত্তা লেখকদেরও সমালোচকদের। রেহাই
দেয় না।'

'ওদের ধারণ। নিত্যক্রিয়া আমারা কোনো সন্তান নেই। বিলাপ সংগীত শোনাই। কি হাসিয়া বাপঁর একবার, ভেবে দেখুন। সতীতা বলতে কি জানেন, আমাদের জীবনে নগরবাসী তরুণী কিছু নেই। ওরা কেবল অন্ধকা, অন্ধকা, নির্ভুল, নির্ভুল জনতা, যাদের বাস্তব পরিপার্শ্বিকতার খবর আমাদের মহামায়া সমালোচকদের কাছে অজানা। ওদের সমস্ত কেবল বয়ের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে নয়। নবজ্ঞানিণীর কোন খবরই ওরা রাখে না। আজকের দিনের তরুণ যুবসমাজ আমাদের কবিতায় পূর্ণপূর্ণ হয়ে গ্যাঙ্গে। ধাককে এবং বাবুকে কথা।' আপনার মেরোটে কিস্তা ভারি চমৎকার। '

'আজমি কবি। আপনিও হয়তো সেটা লক্ষ করেছেন।'

'আঃ বাপি, বাবামণি আমার।' উচ্চ আবেগে একটি উঁচু বক্ত যেন চলকে উঠলো সূর্য সরা রুকে। এবার উনি সত্যি সত্যি ওর চেয়ে কবি হয়ে উঠলেন এবং তখন ওকে রুকে না পারার জন্য ওর নিজেরই ধারাপ লাগলে।

'ভালো কথা,' সূরা জন্তু পেলেন বাপির কোমল কঠিন। 'যদি আমার
অনুরূপিতা মার্জন করেন, আপনার স্বাতাং...'

'ও এখন কোথায় আছে আমি ঠিক জানি না। বছর হয়ে আসে একবার
জননেই মেনে মানুষাশ্রয়ের কথায় যেন মাটিতে করছে। উঃ ওর কথা অনেকে
এখনও আমার গায়ে আর আসে। কিছু কিছু নারী আছে, যাদের সত্তা।
সব মায়া বলতে কিছু নেই—কেবল মনের মধ্যে ভয়, বিষয়একটু। অতঃতক
জাগিয়ে তোলে। আমার মহিলাটিও ঠিক সেই ধরনের। এটা আবিষ্কারের
পর থেকে ওর জন্যে আমার রুক্ষের মধ্যে আর কখনও কেনি হয়নি। তবে
কি জানেন, মাঝে মাঝে জীবন একথেয়ে, কেমন যেন নিঃসঙ্গ লাগে। আচ্ছা, আমাদের চা দেবে না।

'নিঃস্বাভাবিক, একথুলি দেবে। কিন্তু আমি যে-কথাটা জানতে চাইছিলাম... আপনি কি আবার বিয়ে করেছেন, না একই আছেন?'

'এখন একাই আছি। গত সীতা। আমি ডান-কাঁটা একটা পালায় নিয়েছিলাম। সে যে কি অস্বাভাবিক রূপ, তুমি কল্পনার মত পারেন না! ও ছিলো। আমার প্রতিভার অস্বাভাবিক উদ্বেগগুলি। কিন্তু পেটটি বিচ্ছেদ না থাকলে যা হয়, একজনেও তাই হলো। বন্ধুজনের উৎসবে হঠাৎ করেই ওর সঙ্গে আমার দেখা, তখন একটু মাতাল হয়ে পড়েছিলাম—কেমন করে ও যেমন আমার বাসারাই উঠে এলো। আমি নিজেই টের পেলাম না। অবধি পূর্বপরিকল্পনা বলতে আমার কিছুই ছিলো না। তবু সকালে খুব ধীরে জেগে আমি চোখ রাগড়ালাম, আমাদের বিয়ে হয়ে গেলো। নিজেই নিজেই অভিনন্দন জানালাম, ভালো করে সাজগোজ করলাম, তারপরে কি ঘটবে তার জন্যে প্রতিশ্রুতি করে রইলাম।'

বাতাসে ঢেউ তুলে বাপি হাঁ বলে করে হাসলেন। সুবাসীর মনে হলো সে হাসিতে ওর বুকের মধ্যে কি যেন ভেঙে ধান ধান হয়ে গেলো।

'ঠিক রাগকথার মতো শোনাচ্ছে। তারপর কি হলো?'

'তারপর আর কি? জেগে উঠে প্রথমে একপ্রায় চোখের জল, তারপরেই সহস্র চুক্তি আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর একটা সঙ্গ। বেহেড় মাতালের মতো টলতে টলতে কেটে গেলো।'

'আর ওর বাবা মা?'

'প্রথমে ওদের কাছে বাপারটা ও সম্পূর্ণ গোপনই রেখেছিলে। তারপর একটু একটু কেন জীবন তার চিরাচরিত পথে পা বাড়ালে, শুরু হয়ে গেলো যা হবার। প্রথমে ও আগ্রাম প্রসার করার চেষ্টা করলে আমার ভালোবাসা, আমার আশ্চর্য সুন্দর কবিতার সঙ্গে আমার ঘর-পরাগোপাধিক আশাকে ঠিক খাপ খাছে না। তার জন্যে পরমাণু রূপক খরচ করতে হলো। প্রতিভাদুলকালী, কেদিয়ে ও বুক বাড়িয়ে দিলো। সে এক দেখার মতে দৃশ্য! তারপরেই ওর ধারণা হলো। কবিরা নাকি ব্যপারের জীবন, সারাদিন ঘরকূলে হয়ে বসে না থেকে ওদের মাঝে মাঝে কেইও বেড়াতে যাওয়া উচিত। ওর মুল বুটিতে কোথা থেকে এই নির্ভুল আবাসগুলো এলে জুটো সে ও-ই
কবি

জানে। তার সঙ্গে ঝগড়ার টটি, চোখের জল, মাতৃকের জন্যে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ,
এটা চাই ওটা চাই। তোমার আমি পালিয়ে এলাম, কটন গড়ে ওকে চিত্তে জানালাম—‘সবার আগে চাই কবির বাধানতা।’

শান্ত ঘরে বাপি বিকেলে করলেন, ‘তারপর?’

‘এখন মাসে মাসে ওকে পাঁচশ কবল করে পাঠাতে হচ্ছে।’

সুরা মাতৃকের ভেতর দিয়ে যেন হিমেলে একটা গ্রোত বহে যাচ্ছিলো।
তবু বিভ্রম-বিভ্রান্ত চোখে জানলা দিয়ে ও বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

‘তাই রুপে আপনার শেষের দিকের কবিতায় হতাশার হাপ এত সুস্পষ্ট?’

‘মুতির বহুব্যঞ্জন ভিড়ে ভাঙে রাত্রির অগ্নিকারে।’ কবিতার বইটা পড়েছে।

নাকি?

‘নিশ্চয়ই’

‘এই কাব্যগ্রেঢে আমি সেই নির্বাচিত কাহিনীর অনুভূতিগুলোকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি।’

‘খুব ভালোভাবেই ধরে রাখতে পেরেছেন।’ উপলব্ধ বাপি গভীর দীর্ঘস্পর্শে
ফেললেন। ‘গ্রাহী, হয়তো বেগের অদৃশ্য কার্যকরি এর চূড়ি আকারে আপনার
কোন তুলনারা হয় না।’

‘নাও, তুমি দেখছি আমার কবিতার একজন সত্যিকারের পাঠক।’

‘বিশাল। স্বত্বির প্রসব বাদ দিয়েও বলতে পারি, আপনার কবিতা। আমাকে
রীতিমতে আনন্দ দেয়।’

‘ধর্মবাদ। এ ধরনের প্রশংসা সচরাচর কানে আসে না। সত্বি বলতে কি
জানে। প্রশংসা না পাবার মতো একবারে অযোগ্য আমি নই।’

‘নিসসদেহে! চলোন, এবার চা পান করা যাক।’

‘আজকের দিনে যারা লিখছে, তাদের দিকে একবার তাকিয়ে চারো—
আছে কি লেখার ছিনি! কবি তো নয়, যেন সব শক্ত। ভাবার একবারে
আত্মা প্রকাশ করে ছাড়ছে।’

সুরা তাদের হাজারকে পাশাপাশি বাগানের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলে।
তাদের কঠিন অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হতে হতে একসময়ে মিলিয়ে গেলো।

সুরা থাকে থাকে সোঁজ হচ্ছে বললে। ওর রুকের মধ্যে তোমার মনে কি
যেন একটি চেপে রয়েছে যাকে ও কিছুতেই সরাতে পারছে না।

মামলি ভাবলেন, ‘সুরা এসো, চা দেওয়া হয়েছে।’
গ্রিকির শেষ গল্প

স্থান পায়ে ও দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। আয়নায় দেখলো। ওর বিন্যাস গ্রন্থ মুখে, চোখশুটি যেখান হালকা কুইশায় ঢাকা। ও যখন বাহার ঘরে এসে প্রবেশ করলো। পরিচিত মুখগুলো মনে হলো। কেমন যেন অবর্বহীন, ধূসর।

'আমনি কি তবী এখনও নিষ্ঠায় আমার পুরুষ কেন্দ্র নানা?' প্রতিভায় নিয়ন্ত্রিত হলে। কবর কঠিনর।

সুরা কিছু বললো না। শুধু ওর কদম-ছাট মাধার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে বধার চেবে। করলো। যখন ওকে দেখেনি, যখন ওকে ওঁচন তো না, তখন ওর কবি। পড়ার সময় কবির কোনো ছবিত। তার মনের মধ্যে ভেসে উঠেলো।

'ছি সুরা।' বাপি অবাক হলেন। 'কেউ কিছু জিগেস করলে জাবান না দেওয়াটা অশোভন।'

'কি চান আপনারা?' হঠাৎ চোখার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সুরা আর্তবর্যে চিত্কার করে উঠলো। 'আমাকে একটু একবার দিন। মিথুক। মিথুক সব।' হাতে মুখ ঢেকে ও সোজা ঘর থেকে ছুটে ভেসে গেলো।

সোরা ঘরে তখনও প্রতিভায় হচ্ছে ওর কঠিনর—মিথুক। মিথুক সব।

দীর্ঘকালের জন্যে চারজন টেবিলে নির্বিক নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন, অবাক বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ারি করলেন। তাজলের মামণি আর জিনা-জোটে উঠে গেলেন।

বাপি কবিকে জিগেস করলেন, 'ও কি আমাদের কথা অস্বী পেতে শুনে-ছিলো বলে আপনার মনে হয়?'

'কি জানি, আমি তো এর মাধ্যমে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

মামণি ফিরে এলেন।

'ওদের হাসনের বিবর্ণ উদ্ঘোষ চোখের দিকে তাকিয়ে উনি হতাশ ভঙ্গিতে কান্দ ঝাঁকালেন। 'ও এখন কাদছে।'

১৮৯৬
টেরেসা

আমি তখন পড়াশোনার জন্য মক্কা এসেছি, আর নিয়েছি একটি পোশাক ভর্মহিলার বাড়ির চিলেকোঠায়। নাম টেরেসা। শ্রাবন্ধু, রীতিমত লম্বা-চওড়া বলিত গেড়ান, কুকুরুকে কালো। টানা হুট। জুই ছেয়ে দিয়ে টুঁটা-টুলা লম্বাটি রুক্ষ মুখ, তীক্ষ কালো চোখ, ভরাট কঠিন। কুলিকামিন্দের মতো শেষীবহল দীর্ঘতা বাছ। সব মিলিয়ে এমন তেজদীপ উগ্র একটি নারীমূর্তি, যা দেখে অনেক হংসাহারী পুরুষমানুষের বুকও ভরে হুর্শির করে কেঁপে ওঠে। আমি ধারতম ওপরের চিলেকোঠায়, উনি ধারতম আমার ঠিক নিচের তলায়। উনি ঘরে আছেন আমার পারলে আমি পারতা অর দরজা। খুলো কখনও বাইরে বেরুতম না। তবু মাঝেমধ্যে কখনও সখনো সিঁড়ির মুখে কিংবা নিচের উঠানে দেখা হয়ে যেতে। দেখা হলেই উনি ঠোট টিপে এমনভাবে হাসতেন, আমি বুঝতে পারতাম না। আমি লজ্জা পেয়েছি, না আমাকে বিস্মৃত করছেন। মদ খেয়ে মাতলাভ করতে আমি চোখ কমাই দেখতেছি। তবু কখনও মদ খেলে এক কালো। মাচাওর মরিণুটে। মদ এক্ষেত্রে বেরিয়ে আসতে, কাকের বাসার মতো এলামেলা। রুক্ষ চুলগুলো উড়তে, তার সারাক্ষণ হিঁচি করে হাসতেন। তেমন কোন যুদ্ধ দেখা হলেই উনি আমাকে বলতেন, 'এই যে, ছাত্রশাহি, কেমন আছেন?'

তখন তো প্রতি আমার ঘরটা কেমন মনে রেখে যেতো। আর প্রতিবারই মনে হতো—না, ঘরটা এবার না পালাতলাই নয়। কিন্তু আমার ঘরটা এমন নির্জন, খোলামেলায় আর ওপর থেকে চারপাশের দৃশ্যপাত এমন সম্ভব দেখা যায় যে ঘরটা। ছেড়ে দেবার কথা ভাবতেই আমার মন ধারাপ হয়ে যায়।

একদিন সকালের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে তাই কি করে আজকের দিনটি ঘর কাঁকি দেওয়া যায়, এমন সময় দেখলাম দগ্ধ করে দরজার কপাট-চোদুট। হাত হয়ে খুলে গেলো। আর টেরেসার ভরাট কর্কশ কঠিন আমার পিলে পর্যবেক্ষণ চমকে উঠলে।

'এই যে ছাত্রশাহি, কেমন আছেন?'

'চিরতে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম তোর বছর চোখের মরিণুটে। প্রকাশক করছে।

আমি চেয়ারে দোজ় হয়ে বসলাম।' 'কি চান আপনি?'

'আমার একটি ছোট উপকার করে দিতে হবে।'
গরিত শেষ গল্প

'উপকার!' মনে মনে আমার তখন নাতীর ছেড়ে যাবার উপক্রম।

'হঁ, বাড়িতে আমার একটা চিঠি লিখে দিতে হবে।'

ওর কঠিন কিছুটা নরম মনে হলেও, মনে মনে ভাবলাম—সরসনার করার আর জায়গা পাওয়া না তুমি তখনই কাগজ কলম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বললাম, 'কি লিখতে হবে বলুন? না, তার আর বলুন কোথায় কাকে লিখতে হবে?'

'লিখেন বোলেলালালু কাপুটকে। ঠিকানা—ওয়ার রোড, ভেপোডিউনাল।'

'ঠিক আছে, এবার বলুন।'

'প্রিয়তম বোলেলালালা... বিবেক প্রেমিক আমার, অনেকদিন তোমার কোনো চিঠি চিঠি পাইনি। তুমি কি তোমার প্রিয়তমা হোট নরম সোনাটা কে তুলে গাছে না, টেরেসা।'

হাসিতে পের আমার তখন ফেটে যাবার যোগাযোগ। প্রিয়তমা হোট নরম সোনা! বাদবাদি আর কাকে বলে! সাড়ে পাঁচ ফুটের ওপর লম্বা। পালকের মতো। শক্ত শরীরে সে কিনা। হলো হোট নরম সোনা! একেই তো পেশাদার, মতো, তার ওপর সতীষ্ঠনেও দ্রাক্ষে করে না। তবু কোনরকম নিজেকে সামলে নিয়ে নিজেসের করলাম, 'বোলেলালা কে?

'বোলেলালার চেনেন না?' যেন উঠি গাছ থেকে পড়লেন। 'আমার প্রেমিক বন্ধু।'

'আপনার বন্ধু।'

'কেন, মেয়েদের পুরুষ বন্ধু থাকতে পারে না বুঝি?'

'হঁ, তা থাকতে পারে! কিন্তু, আপনার মতো মহিলা... মানুষ না।'

'আপনি কিন্তু বড় বোকা। আজানে, ও আমার ছ' বছরের পূর্ণনা বন্ধু।'

'তাই বুঝি।' আমি গরিতর তুলবার ভান করলাম। 'আচ্ছা, এ চিঠিতে তার ফিল্ট লিখতে হবে না তো?'

'না। আপনার এই উপকারের জন্যে আমি কিন্তু সত্যিই কৃতজ্ঞ। দরকার হলে আমিও আপনার জন্যে কিছু করেও দিতে পারি...এই ধরন জামা-কাপড় কেনে দেওয়া, কিংবা কিছু সেলাই-কোডাই।'

'না না, আমার ওবের কিছু লাগে না। আপনি যে মুখে বলছেন, তার জন্যে অংশা ধরণের।' মনে মনে আমি তখন ওর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ছটফট করছিলাম।

উনি চলে গেলেন।
সত্ত্বা তুরেক পরে, সেদিন সকালের জানলার ধারে চুপচাপ বসে তারক।
বিশ্বাস আরও অনেক বাইরে কোথাও বেরুতে পারছিন, তবে আমার যে মনে কিছু করতে তালো লাগছে না। এখন সময়ের উড়াটি খুলে এলো। 'এই যে হাতেশাহী, একে একা বসে কী ভাবছেন?'

মুখ না দেখেও আমি কঠিন টেরেনারে চিনতে পারলাম। 'না, এই এমনি বসে আছি।'

'আমাকে কিন্তু আর একটা চিঠি লিখে দিতে হবে।'

'নিচুরই। বোলেননে তো?'

'না, এবার আর তাকে নয়।'

'তাহলে?'

'আমি কিন্তু আগেই কথা চেয়ে নিচ্ছি। এ চিঠিটা আমার নিজের জন্যে নয়, আমার পরিচিত এক ভ্রমলোকেরই জন্যে। আমার মতো তার একজন গ্রেমিকার আছে, তারও নামে টেরেনা। এই চিঠিটা সেই টেরেনার জন্যে।'

আমার সঙ্গে এতাবায় মানুষকের কথার জন্যে মনে মনে একাধিক রাগ হল।
আমি আপনা। তাঁর মুখের ওপরেই বলে দিলাম, 'দেখুন, আপনার বোলেনে বলে কেউ নেই, টেরেনা। বলেও কেউ নেই। আপনি বিচিত্রি আমাকে দিয়ে শুধু খাটিয়ে নিচ্ছেন।'

আমার উত্তেজিত কথার পরে দেখলাম তাঁর মুখ চেয়ে চেয়ার। হঠাৎ কেমন মনেনবলে গেছ, হাতের আঙ্গুলগুলো মুখ কুঁপচে। তাঁর মুখ দেখে মনে হলো; উনি যেন কিছু বলতে চাইছেন, অথচ পারছেন না। মনে মনে প্রকাও আমি মুল করিনি তে।! স্বর চেয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অপেক্ষা করে রইলাম। উনি কিন্তু কোথা না বলে এক-পা এক-পা করে পিছু হটে হঠাৎ ঢুকে মতো। ছুটে বেরিয়ে গেলেন। দড়ি করে দরজা বন্ধ হওয়ার শুরুতে আমি চমকে উঠলাম। সম্ভবত তাঁতে পারলাম উনি দারুণ রেগে গেছেন, ভাবলাম তাঁর ঘরে গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আসি।

সেই প্রথম আমি তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছিলাম। দেখলাম টেবিলে হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে উমি বসে রয়েছেন। আমার খুব মারাত্মক লাগলো। এটিটি পাঁচে টেবিলের কাছে গিয়ে যন্ত্র সম্ভব মোলায়েম ঘরে ভাস্কর, 'এই যে মাদাম, ভাবছেন!'

আমার তাক তুলেই চক্তিতে উনি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, উত্তেজনায়
গোকন্দের শেষ গল্প

ষষ্ঠ চোখের মণিমুটো বঁকবক করছে। জয়ে তখন আমার বুক তুরন্ত করছে।
কিন্তু পরম্পরিবর্তী দেখলাম উনি আমার গলাটা ছুঁ হাতে মালার মতো অজ্ঞিয়ে
ধরলেন, তারপর হাত গলায় ফিসফিস করে বললেন, ‘ঈা, আমি মনে নিষ্ঠে—
বোলেস বলে কেউ নেই, টেরেসা বলেও কেউ নেই। কিন্তু তাতে আপনার
কি? ছু লাইন লিখতে কি আপনার এমন একটা কষ্ট হতো? কাগজ কলম
নিয়ে একটু বসা বই তো নয়।’

ওর অপ্রত্যাশিত এই অভ্যন্তরীণ, ওর কান্তা-ভেজা কথায় আমি অন্তর্গত
হয়ে গেলাম। কোনরকম চোখ গুলো আমার আমার করে বললাম, ‘আমাকে
আপনি কষ্ট করুন, মাদাম।’

‘যদি ছু লাইন লিখতে আপনার এতক্ষণ কষ্ট হয়, হঠাৎ উনি আমার গলাটা
ছুঁ দিয়ে কষ্টর হাতে একটা কাগজ এলে আমার হাতে দিলেন। নিন,
এটা আপনি ফিরো নিন।’

প্রথম বিষয়ে আমি কাগজ্যালি দিকে তাকিয়ে দেখলাম এটা বোলেসকে
লেখে সেই চিঠি। আমি তো এর মাধ্যমে কিছুই বুঝতে পারলাম না। তাই
বেশ অবাক হয়েই জিগেস করলাম, ‘কি ব্যাপার, চিঠিটা এখনও পাঠানি? ’

‘পাঠাবি? কোথায় পাঠাবি?’

‘কেন, বোলেসের ঠিকানায়।’

‘বোলেস বলে কেউ নেই।’

‘আর টেরেসা?’

‘বললাম তো, আমি ছাড়া অন্য আর কোন টেরেসাকে আমি চিনি না।’

‘তাহলে?’

‘এই সহজ কথাটা আপনি কেন বুঝতে পারছেন না, আমি তো আর পাঁচ-
জনেরই মতো একটা মামুষ, কিনা নয়? আমারও ইচ্ছে করতে পারে তাকে
চিঠি লিখতে...’

‘কাকে?’

‘বোলেসকে।’

‘উনি তো নেই।’

‘নেই, কিন্তু ওর মতো কেউ একজন তো থাকতেও পারে, যাকে আমি
আমার মনের কথা জানাতে চাই, যে আমাকে আবার তার মনের কথা
জানাবে।’
একটুই ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলাম। আমার থেকে করেক হাত তফাতে এমন একজন মানুষ বাস করে—এ পৃথিবীতে বন্ধ বলতে যার কেউ নেই, যাকে কেউ ভালোবাসে না, যে নিজেই নিজের বন্ধুকে আবিষ্কার করেছে, তার জন্য বুকের মধ্যে আমার সত্তা কর্ণ হল। না জেনে তোকে আমাত করার জন্য মনে মনে লজ্জাও পেলাম।

‘আর টেরেসাকে লেখা চিঠিটা তা?’

‘ওটাই আমি অন্য কাটককে দিয়ে পড়াই। আমি তো পড়তে পারি না। কেউ যখন পড়ে আমি জনি, আর মনে মনে কল্পনা করে নিই বোঝোলে বলে সত্তাই কেউ একজন আছে যে আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। আর সেই রকম কল্পনার মধ্যেই আমার বিচ্ছিন্ন একবেলে জীবনের কূঢ়িন দিয়ে দিনগুলো। বেশ সুন্দর কেটে যায়।’

এরপর থেকে আমি সম্ভাব্য একটা কি ছুটো করে চিঠি তুকে লিখে দিতাম, এবং সহায়তাই টেরেসাকে লেখা বোঝোলের জবাবগুলো। এমন সুন্দর আর করুণ করে লিখতাম, যা পড়ে উনি চাপের জন্য বুক ভাসিয়ে দিতেন। আর তার বদলে উনিই আমার ছেড়া মোট। রিপু করে দেওয়া, জামা-কাপড় কেচে দেওয়া। এতে টুকটিটুক নানান কিছু করে দিতেন। এমনি ভাবে যায় তিনেক কাটার পর হঠাৎ কেন জনি ওর। তুকে জেলখানায় নিয়ে গেলো। এতদিনে উনি নিশ্চয়ই মারা গেছেন।

হা, গলটা আমার এক পরিচিত বন্ধুর মুখ থেকে শোনা।

১৮৯৬
ভাঙ্কা মাজিন

ছ পাশ থেকে চাপা লাশ। মতন হঠে মাথা, বড় বড় চেটালো। কান, নিরিকার ফ্যাকাসে যুথ, ধারালো। চিরুক বিষ্ণু ভঙ্গিতে ঠেলে বেরিয়ে আসা। নিম্নলিখিত বিবর্ণ ছুটো চোখ, দীর্ঘ নাক, দিচ্ছে তোটা কুলে পড়েছে, দড়ি পাকানো, শীর্ষ গলা, চালু কাঠ, টোল মাথায় বুক, গর্ভভাবে মহিলার মতো। উঁচু পেট। বৃহ হাতটা জান হাতের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে ছোট, পায়ঠাটা ধরনের মতো বাকা, মাঝার কালো তাল্প লাগানো। জীর্ণ একটা টুঙ্গি, মাথে এত বড় যে চোখের ওপর পর্যন্ত নেমে এসে বৃহ কানের কাছে আটকে গেছে, আর তার নিচে দেখে ভাঙ্কা মরিয়ায় ভঁট পাকানো। পীতাভ চুলের গুছ। পার জায়গায় সেলাই করা। তালি-লাগানো। রাশিয়ান বহিস্কৃত বেঙ্গল শরীরে একটু দেখা যায়নি, সুর সরু বাকা। ছাত্র পাঞ্জামাটা চলাকাল করছে, মোজাটাটা চেড়া, জুতো জোড়া মাটি অবস্থা। কাহিল। বৃহ, এই হচ্ছে ভ্রাতুজি হুতের ভাঙ্কা মাজিনের হৃদ প্রত্যক্ষ। প্রকৃতি ও তার আপন খেলালখুশিতে গড়ে বেঙ্গল উপহার দিয়েছে, যাতে সবাই ওকে দেখে আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

বৃহ, শেষের উদ্দেশ্যটা ভাঙ্কা মাজিন যাত্রণের সঙ্গে বজায় রেখেছে। যখনই ওর কোন সহকারী ওকে দেখতে পেয়েছে, সউলাসে চিপচিপ করে উঠেছে:

'এই যে, শহরতানের কামরা আসছে!'

শহরতানের কামরা কি জটিল আমি যখনও চোখে দেখি। কিন্তু যখনই মাজিনকে এগিয়ে আসতে দেখেছি, আমার মনে হয়েছে ওর শরীরে অস্তি-মজ্জা বলতে কিছু নেই। তাই ডাইনে বায়ে ও এমন টলমল করছে, যেন সাহসিক হীরার জন্য পায়ের নিচে সমাদৃত মাটি বুঞ্জছে। শিখির হয়ে হুরে আসা দেহের ছু-পাশে হাতজুটো। কোনরকম ঝুলছে, চোখের ওপর পর্যন্ত নেমে। আসা টুঙ্গি সমতুল মাথাটা নড়েছে করছ, সশব্দে জোরে জোরে খাস ফেলছে, যমজ্ঞের থালাটা পিঠ থেকে হুরে গুছে। এক্ষেত্রে বলতে পারি যে, আর ওর বিষ্ণু চোখজুটো। সুদূরে এমন নির্মিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে যেন ও-ছুটো ওর বিশ্বাসী দেহের কোন অংশই নয়।

ওর আর একটা বিষাক্ত আছে হাতকের ভঙ্গিতে আপন মনে গানের সুর ভাঙ্ক। গানের মধ্যে কোন কবি বা শব্দের অর্থ কবর সুর—তাও আমার তার না আছে হুর, না আছে শেষ। গানের সুরগুলো শব্দ, নিদ্রামের কোসরেকাস
ভাংকা মাজিন

আওয়াজ করতে করতে ও যখন এগিয়ে আসে, সত্যিই দেখলে মনে হবে নাটক-বল্কু খুলে-আল্পা পাড়ানো। একটি কামরা যেন ক্যাম্ব্রিয়া শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসে।

এই যে, 'মশা' কিংবা 'নোংরা আঙ্গাকুড়' যখন যে নাম তাদের মাথায় আসতে, সেই নামেই ওকে ভাবতে। প্রতিটি গোলাপক আঁখাই ওকে বেশ সম্মান মানাতে। ও কিন্তু কোন-কিছুতে রাগতে। না। খুব বেশি হলে ক্যাম্ব্রিয়া শব্দ গলায় জিগলে করতে; 'ভোমরা কি চাওটা শুনি?'

ছাড়পত্রে উল্লেখ আছে ওর বয়েস সাতচাঁদিশ বছর, কিন্তু ফেলেছে ছোড়ডাও ওকে ভাবে তাঙ্কা বলে। এমন কি ওর শেষ নাম ধরেও কেউ তাকে না। তাতে ও কিছু মনে করে না, কেননা দাকনাম কিংবা বাবাদের নামের চাইতে এ অনেক ভালো। ভাঙ্কা তার অভ্যাস সহকর্মীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ও নির্ভর ভালো-বাসে, এমন কি অস্বাভাবিক মধ্যেও ও একা থাকতে পারে। পোলবার কিংবা ছুটির দিনে সন্ধীসারী, ডাকলে ও পান্নালায় থায়, কিন্তু অকালের কিংবা চারের পেরোলা নিয়ে বিশেষ দৃষ্টিতে সারাষার শুখু চুখঁচাঁদ বসে থাকে। তাবলে ওকে সামাজিক বলা যায় না। নামান জটিল সমাজবাসী নিয়ে ও গৃহীতভাবে চিন্তা করে। ও যখন প্রথম এই ছুটোরসহদ দলে যোগ দেয়, এমনভাবে লোকজনের দিকে তাকিয়ে থাকতে মনে হতে। যেন ও দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে আছে। দলের পরামর্শদাতা, 'ঠাকুরদার বয়লী প্রথার ছুটোর বুঝা; ওসি ওকে দেখিয়ে বলতে', 'ভিয়াতকার এই লোকটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অস্বাভাবিক রয়েছে। চোখচুটো মরা, দীর্ঘ নেই, মনকে কেবল আলতা করে স্পর্শ করে। ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা ভ্রান্তি রয়েছে। হয় তীব্রতা তিতিবিরক্ত হয়ে গেয়েছে, না হয় তো ওর মনের মধ্যে কিছু একটা আছে যা তার বিবেক-বুদ্ধি-চেতনাকে ভোতা করে দিয়েছে। হয়তো নকারজনকে কোন ক্ষতি। মনের মধ্যে থেকে যার ছায়া ভেসে উঠের দীর্ঘশ্বাসের চোখের মধ্যে। তার মানে লোকটা আত্মী, সব সময় মনে মনে কি যেন ভাবে। নাচ ওর মো। চোখের দৃষ্টি ভালো নয়। কোন মানুষের মন যদি পরিঠার আর ছুঁয় হয়, চোখের দৃষ্টি তার ছদ্ম হবেই। কোন কিছুর দিকে যেখন তাকানো লোক-সৃষ্টি আত্মী ভালো চোখের দিকে তাকিয়ে হাতো; ও যেন এখনও আমাদের চেনেই না।'

সেইদিন থেকে দলের সবাই মো চোখ লোকটার হাবভাব লক্ষ করতে
গুরু করলো। এথমেই ওরা যা আবিষ্কার করলো; লোকটি আদে এথম শেষের কারিগর নয়। লোকটি যে কাজ করে না তা নয়, কিন্তু করাত হাতে বাটালি বেঁধে। যেন ওর হাতে ঠিক বশ মানে না, কীবে। কখনও কখনও মাজিন হঠাৎ করেই মাথায় তার কাজ থামিয়ে যত্নপাতির দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকতো, নিঃসন্দেহে ওর মনে তখন ভেসে উঠতো। নানা প্রতিভাবি।

'হেই, মাজিন-থরা! যুমিয়ে পড়লি নাকি?' সদায় চিত্কার করে বলতো।
কোন কথা না বলে মাজিন আবার তার কাজে মন দিতো।

অন্যার হাসাহসি করতো। 'বাটি একবারে নিঘড়িয়ে।'
মাজিন সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতো, 'কেন, এত তাড়াতাড়ি করার কি আছে?' অন্যার জবাব দিতো না, কেবল হেসে হেসে ওকে ঠাট্টা করতে। ওদের তীর উপহাস ঘুর। বিজ্ঞ কিন্তু মাজিনকে আঘাত করতে পারতো না, উপেক্ষা ভঙ্গিতে ও এড়িয়ে যেতো।

মাজিনকে ওরা চিনতে চেয়ে নাম। কোনো এথমকার ছুটোরদের মধ্যে ওই এসেছে কেবল ভিয়াটক। থেকে, বাকি সবাই নিখুঁতি নভোরদের লোক।
তাছাড়া ও গরিব, জড়বৃদ্ধি আর অলস একৃতির। তবে ওকে নিয়ে ওরা যখন ঠাট্টা তামাসা করতো এবারে সীমা ছাড়িয়ে যেতো। না, কেননা। ওরা জানতো লোকটি অস্বীকার্য অবস্থায়।

একবার ছুটন চুটনের ভাবে একটা কাঠের গুড়ি বয়ে দিয়ে যাছে, মাজিন রয়েছে তার শেষ প্রাপ্ত। সামনের একজন ওকে চেকিয়ে বললো, 'এই, ঠিক করে পা ফ্যালো।' কিন্তু মাজিন তার বৌকানো-থকুকের মতো পা সমান তালে ফেলতে পারলো না, ফলে কাঠের গুড়িটি হুম করে মাটিতে পড়ে গেলো।

'এই বাটি কাঙ্ক্ষারু, ঠিক করে পাও ফেলতে জানিস না। দৈত্যের মতো। বিশাল শরীরের নিয়ে ইয়াকেন ল্যাপটেন্ট ছুষার ছেতে ওর দিকে তেড়ে এলো, এবং মাজিনের পিঠে এক বা লাঠীর বাড়ি করিয়ে দিলে। মাজিন সফল অক্সাটে আর্ড করে উঠলো, কিন্তু একটা কথাও নয় বলে নিঃশব্দে চলে গেলো। তারপর ওরা যখন কাঠের গুড়িটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে কাজকর্ম করছে, মাজিন ইয়াকেনের সামনে এসে দাড়ালো।

'তুমি আমাকে তখন মারলে কেন?' শান্ত হয়ে ও জিজ্ঞেস করলো।

'ভাগো হঁচোয়ানি,' ইয়াকেন চেঁচিয়ে উঠলো।

'কেন, তুমি কি মনিব নাকি যে যখন খুশি লোককে ধরে মারবে?'
‘তোমার বাড়ি এখান থেকে। নিলে তোর সেই সোজ। যেমন বাড়ি পাঠিয়ে দেবো, উক্তনের কি কথাকার।’

‘মাজ্জি, কিসের জন্য তা?’

‘আর না ইয়াকভ ওর চোখে হল। ওই জন্য ও এখানে ঘুরুঘুর করছে।’

কে মাজ্জি ভাবল। ইয়াকভও ওর পথের পথ ছিল। মাটিতে এরাই 
ও সোজা হয় দাড়ালো। মাজ্জি নিরাকার। কেননা শক্তির সমানেক 
সবাই শখসের চোখে দেখছ। আর ইয়াকভও তাঁকার এই লোকটির কাছে বিনা 
প্রতিফলন তার হাত কিউটের সমানেক জিন্মন দিয়ে রাজি নয়। তাই 
জামার আশ্চর্য গুটি ও এগুলো হয়ে দাড়ালো।

‘আর, বেড়ে আর বাটার, তোর কোন একটি পাত্র। আমি বহে দিই।’

মাজ্জি দক্ষিণ-দক্ষিণে ঘর বললো। ‘বেশ...’

‘সের দাড়ালো, সব দাড়ালো একটি এর চাঁদের লড়াইর মধ্যে নাক 
গলায় না।’ বুড়ো তায় আদেশ দিলো। ‘উচ্ছ, তোমার চুঁচন মাচার ওদিক 
থেকে সব এসে।’ নাও, এরাই শান্ত করে। কেউ কিছু চালাকি করবে না। 
ঈশ্বর তোমাদের সহায় বোন। নাও! চালাও!’

মাজ্জির বাইকেমরে কোনাকভ করে একটি। শক্তি হলো, কিন্তু চোখের পলক 
পড়া আগেই ইয়াকভের বিশাল শরীরটি মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। প্রচুর চুঁচু চোখের পলক কেরামত তাকালো। আর জায়গাটাই হাত বোলালে 
বোলালে মাজ্জি রক্ষণায়ের অপেক্ষা করে রাইলো। উনাদের মতে। কিছু বেগে 
ইয়াকভ ওর দিকে থেকে এলো। ধীর মস্তিষ্কে মাজ্জি ডান হাতে এগেই 
জোরে ওর মাথায় আঘাত করলো। চোখের ভিড় করে দাড়ালো। দক্ষিণের 
দেখলো। ইয়াকভ ঘুরপীক থেকে থেকে মাটিতে পড়ে গেলো।

‘যুবে মোর কোথাকার! কেন তুই আমার মাথায় আঘাত করলি তা? দেহের 
আর কোথাও যারা এসে না। বাটা রামগুড়ের ছানা? বাটা এসো। তুই 
কোথাকার, মানুষের মতো লড়তে পারিস না?’

সবাই ধীরে করলো। মাজ্জি নড়তে না জানলেও শক্তি ওর বেশী। ‘তুমি 
যদি আগে আমাকে না মারতে, আমি তোমার সঙ্গে লড়তে যেতুম না।’ মাজ্জি 
হাত পা নেড়ে তুষণের। ‘এখন বুঝলে তো? তাও তো দয়া করে জোরে 
মারিন। যাও এবার ঘোয়া মাথায় একটি ঠাণ্ডা জল চাপড়িয়ে এসো। দেখবে 
সব ঠিক হয়ে গ্যায় হো।’ তারপর নড়তে পায়ে টলতে টলতে ও চলে গেলো।
গফরের শেষ গলা

‘ব্যাটা আচ্ছা শরতান তো! ’ চুকিবরদের চোখ থেকে তখনও মুছে যায়নি বিশ্বয়ের ঘোর। কেমন করে পুঁক একটা লোকের পকে ইয়াকড়ের মতো বুনো- মোষকে কুপোকাট করা সম্ভব কিছুতেই ওদের মাথায় চুকছে না।

‘বাংলা হয়তঃ হাজীর লোকটা। আজ আমাদের বড় ভালো। শিক্ষা দিলে।’ বুড়ি ওই সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললে। ‘না, লোকটার দিল আছে। আর ইয়াকড়েও ও উচিতত্ব কথাই বললে। ওর শব্দ-শব্দে হাত চালানো। উচিত নয়। আমরা সবাই ঈগরের সূত্র। যেহেতু কারণ না থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা একে অপরের থাকে। লাফিয়ে পড়তে যাবে? আর জেতার পরে ইয়াকড়ে ও কি বললে? না। যাও, এবার গিয়ে মাধায় একটা ঠাইও। জল চাপড়িয়ে এসো! খুব ঠিক কথা। ওর শব্দ-শব্দে এ রকম মাথা গরম করা। উচিত নয়।’

‘তার আগে আমাদের উচিতত্ব বরং ওটাকেই দূর করে দেওয়া।’ পাশ থেকে কে যেন কথাটা বললে।

‘না ও যে আমাদের মতো নয় এ কথা সত্যি। কিন্তু ও তো সোনার আচ্ছায় করেনি।’ বুড়ি ওই সবাই ভেবেচিন্তা বললে। ‘দূর করে দেওয়ার সময় এখানে হয়নি। আর একটু অপেক্ষা করে থাক্যো। হয়তো ও বললে যেতে পারে, হয়তো। আমাদের সঙ্গে মিশ থেতে পারে।’

‘ও আমাদের কোনো কামেটা লাগবে শুনি?’

‘সনেহের সেই যে ও কুড়ে, তবিষ্টি কিছু করতে পারে না। কিন্তু ও-ও তো মানুষ। আমাদের আর পাচ্ছেনরেই মতো খাওয়ার, কর দেয়ঃ ঠিক কি না? ওষুধ-ষুধু কি করে আমরা ওকে দূর করে দিই? আমরা যদি ওকে দূর করে দিই অন্যমাতে দেবে। তখন ও কি করে রোজগার করে থাকবে?’

যেহেতু আর কেউ প্রতিবাদ করেনি, ভাংকা মাজিন রয়ে গেলো। ওদের সঙ্গে। প্রথমে ওর অন্য কথা করলো মাজিন নিজে ওদের সঙ্গে 'মিলিমিশ করে নেবে, শেষ পর্যন্ত ওর নিজেরাই ওর সঙ্গে মিলিমিশ করে নিলো। এবং ওর নিলো। ওই ওদের মধ্যে সবচেয়ে নিকট। ফলে ওকে নিয়ে আবার সবাই হাঁস-হাস্যের জুড়ে দিলো। কখনও কখনও নির্মমতা চরমে উঠতো। কিন্তু কেউ কখনও ওকে দূর করে দেবার কথা ভাববেন ওর এই রয়েসের কাজ করার সবাই মনে নিলো, এবং সেই কাজের জন্য ও সম্ভাবনা দূর করে মজ্জার আর বিনিময়গুলো খাওয়া পেতো।

সেদিন বছর নামে একজন রবার্ট ধনী বলিকের পাঁচ বাড়ির সবচেয়ে
ওপরতলায় ওরা ভারা বীধাবীধির কাজ করছিলো। হৃপুরের দিকে ঠিকোদের
জাকার ইত্তানোত্তিক কলেবরতনিজে কাজ দেখাশোনা করতে এলেন। কুমড়ে-
পটাসের মতো। গোলগাল চেহারা, লাল মুখ, গালভর্তি লম্বা লালচে দাড়ি।
ধূলির বরের অকজৈ বাঁধায় চেখ, যা কিছু দেখায় এক ঝলকেই দেখে নেন।
একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই উনি বলে দিতে পারেন কোথায় কত লোক
কাজ করছে, কার কি অভাব। লক্ষ্য করলেন ভাঙ্কামাজিন একবার কোন
কাঠের তক্তায় মাচায় বলে আনতে অনেক সময় নিচ্ছে।
‘এই, বাটা। ছাগোকারা।’ কুঁড়া সরে উনি চিংকার করে উঠলেন। ‘তাড়া
তাড়ি টাড়ি, টাড়াটাড়ি।’
মনিবের মেজাজ বিগড়ে থাকতে দেখে সবাই কৃত হাত চালালে। কিন্তু
মাজিনের হালভাবের কোন তর্কতমা ঘটলে না।
‘আঁচল, তোমরা সব কোথায় মাখা মোটা বলো তো। তোমাদের আমি
গইগই করে বললি নতুন তক্তা বাবাহার না করে ভারার জন্যে সব পূরনো। তক্তা
বাবাহার করবে?’
‘পূরনো তক্তাগুলো বড় অপলক হয়ে গাছে, জাকার ইত্তানোত্তিক।’ লেজ
নাড়া সুত গাইগই করতে করতে ইয়াকে ল্যাপটোব বলেই ফেললে।
কলেবর গর্বন করে উঠলেন। ‘তক্তার তোমরা! কি বোঝ হে, সেদিনের
ছোকরা?’
আঁধ ধর্ষার জন্যে সবার বুক তিনি বীশ পাঠার মতো কিংকিরে ছাড়লেন।
শেষ বিরতির অবকাশে সবাই যখন থেতে বসলো, উনি নিঃশব্দ পায়ে ভারা
বেয়ে উঠে শুরু করলেন।
‘বাটা যে তালকুঁড়া।’ বুড়ো ওসিপ বিড়বিড় করে বললে।
‘উটকে বেঙ্গলা একটাই।’ ইয়াকের মনের সুতে বললে মেইলালে।
অন্য ছুঁতৌররাও নানা মন্ত্ব করলে। কেবল ভাঙ্কামাজিন একটাও কথা
বললে না।
ইতিমধ্যে কলেবর চারতলায় ভারায় উঠে গেছেন, পায়ের চাপে তক্তাগুলো পরিব্যে করে দেখেছেন। এখান থেকেও সোনা যাচ্ছে ওর জুতোর মচল
শব্দ। হঠাৎ চিড়-খাওয়ার একটা আওয়াজ কানে এলে—অনেকটা তক্তা থেকে
পেরেক খুলে আস। শব্দের মতো, আর ঠিক তখনই গড়মুড় করে ভারার করেকট।
তক্তা ভেতে পড়লে।
বুড়ো ওসিপ চমকে ঘুরে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে অম্বুট আর্তনাদ করে ও লাফিয়ে উঠলো। নেই মুখের ঝে শোনা গেলো। ভার্ড একটা চিত্কার, ‘বীঠাও! বীঠাও!’

চুটেরদের গায়ের রঙ তখন গলে জল। পোর থেকে বীঢ় সমেত মাচাঁচটি লালের বেঁধে পড়েছে। খুলোর মেছ উঁচিয়ে মাটিতে খেলে খেলে পড়েছে ঠক। কাঠের চোকলা, ভাঙা ইট। আর তার মধ্যে থেকে শোনা যাচ্ছে কলোবদের অম্বুট বিমল আর্তনাদ তাঞ্জিতাকেঃ ‘বীঠাও! বীঠাও!’

যে খেজিনে ছিলো তুষ বিখ্যাতে সেদিকে তাকিয়ে নিশ্চল দাড়িয়ে রইলো।

বুড়ো ওসিপের সত্ত্বেও কেউ এক পাও নড়লে না। ‘তখন না আমি তোমাদের গাইয়ের কর্ম বলেছিলাম তোমাদের গায়ের কর্মকা পেরেক ঠকে দাও, আমার কথা তোমরা। কানেই নিলে না। আর এখন তোমাদের চুলের জন্যে একটা মামলা মরতে বসছেই। হু করে দেখছে কি? যাও, গিয়ে তুই চেনে তোমার চেয়ে।’

‘এত চেলাকার কি আছে?’ ইয়াকের বললো। ‘তুল আমাদের নয়, চুলটা হাঁড়নিজের। উনিই আমাদের নতুন তত্ত্ব নিতে বারণ করেছিলেন।’

কে মন ওসিপকে বললো। ‘তুমি পেরেকের কথা বললো, কিন্তু উনিই তো আমাদের কম পেরেক দিয়েছেন, যাতে না বাঙ্কে খরচ করি।’

আমি আর একজন কোস করে উঠলো। ‘তার জন্যে কি আমরা দারী?’

বুড়ো ওসিপের লাল মুঁটে তখন উঁচিয়ে খরচ করেছে। কাপা কাপা হাতে বুড়োকুললোকে ঠেলতে ঠেলতে ও বললো। ‘তা বলে আমরা তরোর আমার মামলাটাকে এবারে মরতে দিতে পারি না।’

একের পর এক ভাঁটার বিভিন্ন অংশ তখনও ভেঙে ভেঙে পড়ছে। গুননে চুন-সুরকির একটা বালিত সর্বত্র মাটিতে আছেরো পড়লো। খুলোর মেছে ঢেকে গেলো সামনের দৃশ্যালী। এখন আর শোনা যাচ্ছে না কলোবদের আর্তনাদ।

‘ঈডাও, আমি গিয়ে দেখে আসছি।’ মাজিন খুলোর মেছের মধ্যে দিয়ে লালের বীরে আর্তে এগিয়ে গেলো।

‘মারা পড়বে। যেও না, যেও না, শোনো...’ করোনো মারহর চিত্কার করলো।

‘কেন ও গেছেন ভালোচের? কোন ভয় নেই, ভাংকা, ঈশ্বরের নাম নিয়ে এগিয়ে যাও।’
কারুর নাম না নিয়েই মাজিন নিঃশব্দে বরাবরের মতো বীক্ষা পায়ে টলমল করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেলে।

খুলার মেঝ সেরে যেতে বিধির্ন তার খানিকটা। অংশ চোখে পড়লো। কয়েকটা বাঁশ, কাঠের ঝুঁকা। এমনভাবে হলছে যেন পড়লে কি পড়েন না। এখনও ঠিক করে উঠতে পারেন না। জানালার কাঠামো থেকে একটা তারি তক্তা ভীষণভাবে হলছে, কেননা তার এক প্রাপ্তে কলোবর চার হাত পা ছড়িয়ে গঞ্জকচ্ছেদের মতো লেপে ঝড়িয়ে ঝোলে আছে। কিন্তু দশাসই একটা মাষসের ভারে ৩টা যে-কোন মুহুর্তে ভেঙে পড়তে পারে কিংবা কাঠামোর মাথা থেকে খুলে যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই চালতলার ওপর থেকে পড়ে ছাড়ে হয়ে যেতে এক মিনিটও সময় লাগবে না। তাই এই মুহূর্তে উনি আর নাড়াচাড়া করছেন না। বা ঠেঁচাছেন না, যেন তক্তার সঙ্গে জমে গেছেন।

'ওর ওই দৃশ্য দেখে সবাই অত্যন্ত। অথচ একটুই পরেই ভয়ে কেটে গিয়ে দিগন্ত উৎসাহে জনতার উপদেশবামী শোনা গেলে।

'শিকগির নিচে একটা ত্রিপল ধরে, তার ওপর উনি লাফিয়ে পড়বেন।'

'যদি অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকেন ?'

'ওপরে গিয়ে বর্ণ তক্তাটা ধরে টানো।'

'ভেঙে যেতে পারে।'

'বাঁশ দিয়ে ঠেকো দিলেই হবে।'

'আঁচল বুকু তেন! অত বড় বাঁশকে কোথায় পাবে ?'

'এই, তাছাড়া চাও। !

সবাই দেখল। মোটা একটা কাছি হতে মাজিন জানালার সমন্বে এসে বাঁধিরেছে। ও যেন কি বলছে, কেননা ওর ঠেঁট নড়তে। সবাই নিঃশব্দ, নিঃশুন বাচাল।

'জাকার ইহানাটিচ, এই যে শুনছেন ? আমি দড়িটা হুঁড়ে দিচ্ছি, আপনি কানাটা তক্তার মাথায় লাগিয়ে দিন। চুন্তে পাচ্ছেন ? এই যে, নিন। !

কাছির একটা প্রাপ্ত মাজিন শুনে দিলা এবং সেটা পড়লে। কলোবরের গায়ের ওপর। ধীরে ধীরে খুব সম্পর্কে উনি নড়লেন। তক্তাটা হলে উঠলো। শোনা গেলো অশুভ অধিকন্দ।

'ভয় পাচ্ছেন না, ইহানাটিচ। ঐখানের কাছে প্রার্থনা করুন, আর মাজিন যা বলছে তাই করুন।' নিচে থেকে বুড়ো ওসিপ চিন্তাকর করে বললে।
অর্থায়ন নানা উৎসাহ দিলে। অভাব সত্যত্তে আধ্যাত্মিক ভঙ্গুতে কলোভয় কোনরকম ফাঁসী। তক্ষণ অবগে পরিয়ে দিলেন।

’হা, এখানে খুঁটন করে জুয়ে থাকুন।’ কথটা বলে মাজিন পিছিয়ে গেলে, তারপর কাঁধটা ধরে ঠান্তে শুরু করলে। তক্ষণ শেষ প্রাপ্তাটা এখান ধীরে ধীরে উঠতে লাগলে।

’একদিক ভাঙা, সাকাস।’ ওর কাও দেখে রোদো নিচে থেকেই চেঁচিয়ে উঠলে। ‘ঘাও যাও, দোকা হাটাওয়ালা। শিনশির গিয়ে ওকে সাহায্য করো।’

কোষ করে বাড়িতার দিকে ছুটে গেলে। তত্ত্ব কাচার বাগা প্রাপ্তাটা এখানে উঠে গেছে যে তক্ষণ জ্ঞানলাই দিকে হড়কে এল। ‘এখান কার্যকর মতো হামাঘড়ি দিয়ে আঁটে আঁটে এগিয়ে আসুন, জাক ইচ্ছানোভিদি। খুব সহজ। না না, তবে নেই, তত্ত্ব তাড়বে না।’

বিপদ তখনও কাটচি কেনান। তত্ত্বাটা মেকোন মুক্তিতে সরে যেতে পারে, তবু নিতের সরাই হাসাহাসি করছে। কলোভলের সাম। দেহ গুলোয় ঢাকা, বিবর্ধ মুক্ত হই হয়ে গেছে, চোখছটে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। সে এক দেশার মতো দৃশ্য-যেমন মর্মম্পর্শী, তেমনী করণু। সারাহালে মাঝাটা একটু তুলে বিশাল ভালি দেয়া। শুকতের মতো বেঁকিয়ে উনি যত জ্ঞানলাই দিকে এগিয়ে আসছেন, জনতা ততই উঁচুচিত হাসিতে বেটে পড়ছে।

’আমি বাজার দেখে বলতে পারি তোর পেটে নিচুদিন কোন গোঁড়া চুক্কেছে।’

দেওয়াল রঙ করায় মঞ্চর ঠাঁট। করে বললে।

’আজ ওলা বা ভালো নিয়ে হবে না।’

’আমাদের থেকে থেকে বিচারের অনেক দিন থেকেই পেটা মোটা হয়ে আছে।’ ঈরকতকে আজ সবচেয়ে চুল্লি মনে হলে।

গুঝি মেয়ে কলোভল জ্ঞানলাই কাছে আগেই গোঁড়া গিয়েছিলেন; এখানে চুম্বন মাছের বাঁধে তার দিয়ে যেতে দালালেন। হাজিরকচে পরে তবে দেখা গেলো। ভিড়ের দিকে এগিয়ে আসতে। ছুটের মতো নোংরা, বাজে ভেঙ্গ।

নারা শহীর কোনরকম একটা পা টেংনে টেংনে হঁটছেন। ধরাধরি করে ছাকড়া গাড়িতে বিদেয় ওকে নিয়ে যায়া হলো। ভিড়ে ভেঙে যার পরেও কোরকজন মাজিনকে সেই ধরলে। ওয়ামুক হয়ে ওরা শেষে করলে কি করে মানসিক উচ্চার করার বৃত্তাটা তার মাঝার এলা।

গন্ধির হাতে নিয়ে মাজিন এককশ চুলচাপ দাড়িয়ে ছিলেন। এখান সেটা
সে বললো। ‘জানি না। তর্কাটার জন্যই উনি বেঁচে গেলেন। আমার খিদে পেয়ে গাছছে, আমি থেকে চল্লুম।’

‘কিন্তু তুমি নিজেও তো মারা পড়তে পারতে? তখন কি হবে? ?
‘না, মারা পড়তে না।’

‘মাজিন, তুমি এখানে! আর আমরা সারা বাংলায় তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াছি। তাই তো বলি ও কোনো থাকতে পারে, না, এসে দেখি বারু এখানে!’ বুঝি ওসিপ় ঠিকেদারকে পেয়ে ফিরে আসতে না। আসতেই গড়-গড় করে কথাগুলো। বলে গেলো। ‘চলো, আমাদের সঙ্গে খেলে চলো। ঈশ্বর তোমার সহায় হয়েছেন, মাজিন। না হলে তর্কাটা দিকে তাকিয়ে ছাড়ছো, ওটা এমন একটা কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু উনি চাননি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ মারা যেক। তুমি অবশ্য তোমার কর্তব্য নিশ্চয়ই পালন করেছো।’

বুঝির পাশাপাশি বেঁটে গেলেও, ওর আবেগ-নির্ভঙ্গে মাজিন খুব একটা কানই দিলান।

‘তোমার কোথায় আছিস লাগেনি তে?’

‘না। পায়ে এই সামান্য একটুঃ’

‘খুব বাঢ়া করছে?’

‘না না, ও কিছুই নয়। আপনিই সেই যাবে।’

‘দেরা দিয়ে খানিটা। যে দিও, দেখবে ঠিক হয়ে গাছছে।’

‘তার চাইতে বরং খেলে কাঙ্ক হবে।’ একটু নিশ্চিততার পর মাজিন বললো, ‘অবশ্য যদি জোটে।’

বাছাদের মতে। খুশিতে বুঝি চলকে উঠলো। ‘অবশ্যই, আমি তোমাকে জুটিয়ে দেবে।’

খানাপিনার পর ছুঁতোরা। সারা পানশালায় বলে জটিল করছে। আসলে ঠিকেদারের ফিরে আসা এবং ভাল। সংক্রান্ত ব্যাপারে তার পরবর্তী হিন্দুমের জন্যে ওর অপেক্ষ করছে।

‘দেখে, উনি খুব শিক্ষার ফিরে আসবেন।’ ঈরাকের বললো।

‘নিশ্চয়ই,’ তুলু আফোনিয়া। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষ্ণু যে বললো। ‘না হলে কে আমাদের ছিড়ে খাবেন, কে বলবেন তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমরা ইচ্ছে করে এই সব কাও করেছই।’

‘কেন আমাদের ছিড়ে খাবে না?’ বুঝি। জিগেস করলো। ‘এর জন্যে তো।"
আমরাই দারা। এটা অবশ্য ঠিক যে তফাত্তে হয়তো পুরনো ছিলে; কিন্তু আমাদেরও তো চোখ হাত পা ছিলো, নাকি ছিলো না?

কথা জুড়ে দিলেও রুদ্ধর সঙ্গে কেউ মুক্তিতে পেরে উঠলো না। তফাত্তে গোলায় খুব মজবুত কিংবা পেরের সরবরাহ সুপ্রচুর না থাকলেও, ওদের সতর্কতাতে অভাব ও কোন অংশে কম ছিলো না। এবং তার জন্যে ওদের ওপর কুয়াশা হবার অধিকার কলামের আছে।

'এখন এসব কথা বলার কোন মানেই হয় না।' ইয়াকভে স্বীকার করিয়ে অধিকারের কথা যদি বলে, আমাদের ওপর আলতু-ফালতু দেও করাও কোন অধিকার ওর নেই।'

কথাটা মিঠা নয়। তবু সবাই কেমন যেন মনমর হয়ে রইলো। কিন্তু জাকার ইতানোবি যখন নিঃশব্দে পাইনের ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং কারুর ওপর হ্রদ্বিত্ব করলেন না, তখন সবাই যশোর নিঃশাস ফেললো।

উনি জিগেস করলেন, 'ভাংকা কোথায়?'

ছুতোরদের মধ্যে তিনজন ভাঙ্কা ছিল। ওদের ছুতন বেঁধে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট চোখে ঠিকেরদের দিকে তাকালো।

কলাবড় দা নাচিয়ে প্রথম করলেন, 'আর একজন কোথায়?'

'কে, ভিয়াতাকার ভাংকা ? ও তফাত গাড়ীর ওপর ঘোরে ধুমুখে ভাঙ্কা ! হেই ভাঙ্কা ! মন্যা, তোকে ভাঙ্কিয়ে।'

মাজিন আড়ছোড়া। ভেড়ে হাই তুলতে তুলতে পাইনের প্রবেশ করলো।

কলাবড় এমন গভীরভাবে একটা খাদ মনে যে ওর ছুড়িটা নেচে উঠলো, চিবকের হ্র পাশে চেড়ে গেলো।

'এসো মাজিন,' ধীরে ধীরে উনি শুধু করলেন। 'তোমাকে আমি সামান্য কিছু বললে চাই। এটা প্রামাণ হয়ে গাছে যে এইসব শিমপটালঘুলোর মধ্যে তুমিই সবচেয়ে চটপটে আর রুক্তিমান। তুমি না থাকলে হয়তো আমার আজ মৃতুই হতো। কেননা এগলো কেউ মানব নয় বিবেক-রুক্তিমান চের কাঠের এড়ি। সে মাই হোক, আমার জীবন রক্ষা করার জন্যে আমি তোমাকে আমার হাড়ের আস্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

ফ্রসনা-কল্পনা চোখে এক রূপক দৃষ্টি রুলিয়ে নিয়ে কলাবড় তাত্কালিক-উৎকর্ষিত প্রতিটা কোথুমারী মুখের ডাক্তার পড়ে নিলেন।

'তোমরা কি ভাবছে আমি জানি। ভাবছে ভাঙ্কাকে দেওয়া পুরস্কারের
টাঙ্কা মাজিন

টাঙ্কায় তোমার সব মদ গিলবে? উঁচু, ওটি হবে না। টাঙ্কা, এই টাঙ্কাটা দিয়ে তুমি যা খুশি কোরো, কিন্তু তোদের একটা ফিটেকোটাও দিও না।'

মাজিন অবাক হয়ে গেলো। 'কিসের টাঙ্কা?

'ঢাকার ঢিচ্ছি। এই নাও।' টাঙ্কার তীন লালের একটা নোট মাজিনের হাতে গেছে দিলেন। তারপর উজ্জল গরিম চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অসংখ্য ধন্যবাদ, টাঙ্কা।'

মাজিন কিছু অপেক্ষা চোখে হাতে-ধরা নোটটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'তার মানে এটা কি আমার জন্য?' শান্ত ঘরে ও কিছুদেশ করলে।

'আছে বোকা তে! তুমি! নিশ্চয়ই, নইলে আবার কাজ জন্য?'

'হ'। তার মানে, অন্যান্যে বলতে গেলে।' দড়ি নিয়ে ওঠার জন্য...'

'ঠিক তাই।' মাজিনের নির্দেশ বিষয় ভঙ্গি দেখে কলোরড হেসে উঠলেন।

'আপনি কি মনে করেন তিন কবলের জন্যে আমি এ কাজ করেছি?' ওর চোখের থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে মাজিন কিছুদেশ করলে। তখনও ও বিস্ময় চোখে নোটটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'কেন, তোমার কি খুব কম বলে মনে হচ্ছে?' শক্তী গলায় বিভিন্ন করে কলোরড আবার প্যাকেটের পকেটে হাত পুরলেন। মাজিন আড়তে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর গভীর একটা দীর্ঘকাল দেখলে ধারে ধারে মাখা তুললেন। পচা বাঁধাকপি খাওয়ার মতে। মুখটা ওর আপনায় থেকেই বিকৃত হয়ে গেছে। 'তাহলে আপনি ধরেই নিয়েছেন যে তিন কবলের জন্যে আমি এ কাজ করেছি, কি তাই তো? নিন, ধরুন। সত্যই আপনি একটা নির্দেশ, আমার ইত্তেতিকিতি। মনে রাখবেন আপনার দূর্ভূত জীবন বিচারার জন্যে আমি ওঠে উঠিয়ে থাকি না, আপনার এই তিন কবল পুরস্কারের লোকে নয়! নিন, আপনার পুরস্কারের টাঙ্কাটা নিয়ে সোজা এখান থেকে কেটে পড়ুন ন। যান, বেরিয়ে যান। আপনাকে আমি আর সহজ করতে পারছি না।'

'কি বলি? আমাকে সহজ করতে পারছিস না? আমাকে...আমাকে তুই বেরিয়ে যেতে বলি?' রাগে অপমানে ঘর্ঘরায় গলার বর তখন ওঠে উঠলো।

'আর তোমরা, তোমরা সব দাঁত বার করে হাসছে?'

'বেরিয়ে যান, আমার ইত্তেতিকিতি।' মাজিনের গলার বর চড়ে উঠলো।

'আর আমার টাঙ্কা পরমা নিয়ে দিন, আমি চলে যাচ্ছি।'

'সাবাস!' বুড়ো ওসিপ চেঁচিয়ে উঠলো। 'এই তো মরদের বাচ্ছা!'
টিকাডারের অবস্থা তখন সপ্তম নিকট মায়ের মতো। প্রতিটি প্রতিযোগির বিশালীয় হিমেল দৃষ্টি এসে পড়েছে তাঁর মুখের ওপর। উনি স্পষ্ট অনুভব করতে পারলেন একবার তিনি তিন করে মনিবের যে মন-সম্মত তিনি গড়ে তুলেছিলেন, এই মুহুর্তে তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। তবু উনি চলে যেতে পারলেন না, কি করে তাকে পেয়েছে কবে রাখলে। সবার দৃষ্টির সামনেই উনি দ্বিতীয় হয়ে সাড়িয়ে রাখলেন, টোটের কোণে ফুটে উঠলে। কুর বাকা। হাসি। 'বেশ, আর কি বলবার আছে বলে ফালে।'?

'না, দিতাই তোমার সাথে আছে, ভাংক।' আনন্দের অতিশয়ে রুদ্ধ ওসিপের চোখচুটি। চকচক করে উঠলে।

'ওঃ, রুদ্ধ শুকনো, টুমি এর মধ্যে রয়েছে। বেশ, ঠিক আছে। আমি ও তোমাদের মঞ্চে দেখাচ্ছি।'

অথচ উনি খুব ভালো। করেই জানেন তাঁদের কিছু দেখাতে বা দিতে সম্ভব অক্ষম। তাই আর কোন কথা। না। বলে গলাট করে লোক। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

'বাঁ, খুব ভালো। বলেছেন, ভাংক। ঠিক বলেছে।' রুদ্ধ। ওসিপ আনন্দের চোখটি মাজিনের চারপাশে করেক পাক ঘুরেই নিলে। 'ওরা ভাবে টাকা দিয়ে বুঝ সব কৃতজ্ঞতা সব অন্তরিকতা। কিনে নেওয়া। যায়। টুমি ঠিক করেছে, ভাংক। মুখের মতে। জানাব দিয়েছে।'

সবাই রুদ্ধের পাশে অহংকার ঘাবের ভাংক। মাজিন আজ্ঞা মনিবের ওপর যে ব্যাপার করবেন। তার নিমন্দেহ উল্লেখযোগ্য। তাই কৌতুহল সিরিয়েভে লেখায় বিষয়ে ওর। মাজিনের দিকে তাকিয়ে রইলে। যেখন লুকনো। বন্ধুক থেকে মাজিন একপাঁচ তাঁদের ওপর গলি চালাবে। অথচ পরমুহুর্তেই মাজিনের সেই বোকা বোকা চেহারাটি। আবার তাঁদের চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠলে।—অন্য আর পাঁচজনের চাইতে যে বিভ্র; বিষয় আর অস্থিয়াহীন।

সেইদিন সদ্যেবারের মাজিন আছে রুদ্ধ। ওসিপ একটা। চায়ের দোকানে বসে চা পাঁচিলে। ওদের হুপরকেই ঠিকেদার কাজ থেকে বরখাস্ত করেছেন। মাজিন নিঃশব্দে রুটি চিবুচ্ছে আর রুদ্ধ। ওসিপ হুপরের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছে।

'রুদ্ধে গেছেছি তিন রুকবের ব্যাপারটি। তোমাকে মম্মাহত করেছে। খুব স্বাভাবিক। নিজের জীবন বিপন্ন করে তুমি যে ওপরে উঠে গেলে, সেটা।
কিসের জন্য? যেহেতু তোমার মায়া হয়েছিলো। হাজার হোক, আমাদের মতো উনিও তো মানুষ। আর আমাদের সবাইরৈ হৃদয় বলে একটা পদার্থ আছে। তার বলে উনি কিন্তু তিনি কোথা রয়েছে তার দারুণ চাইলেন! অথচ অর্থের কোন প্রয়োজন ছিলো না। মন প্রাপ্ত চলে তুমি যে কাজ করলে, তার মূল ওঁর কাছে তিনি রূপ ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। নিশ্চয়ই, এটা রীতিমতো অপমানকর বইকি।'

কোন রকমে রূপটা গিলে মাজিন চায়ের গেলাসটা তুলে নিলো। তারপর ধারে ধারে গেলাসে চুমক দিতে দিতে বললো, 'এত সহজে ওঁকে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। আমার উচিত ছিলো। ওঁর চূলের মৃত্যু ধরে টেনে আনো। কিন্তু পারিনি। ওঁর জন্যে আমার খুব ধারাচ্ছে লাগছিলো, দেখলেন যে নিভান্ন একটা মুখু ছাড়া উনি আর কিছুই নন। ওঁর মতো একটা মামলার কাছ থেকে এ ছাড়া তুমি আর কিবা আশা করতে পারে, বলে।'

হাতের ভঙ্গিতে ও বুড়ো। ওসিপকে ব্যাপারটা ছেড়ে দেবার জন্যে ইঙ্গিত করলো। তারপর সবকে গেলাসে চুমক দিলো। আর প্রতিটা চুমকের আঘাতটুকু ও যেন জিব দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে গঁেঁ করতে লাগলো। পরম ভঙ্গিতে।

১৮৯৭
আপনি নিয়ে

বিরাট অজগরের মতো যাত্রিবাহী ট্রেনটি ধৌরার মেছ ওড়াতে ওড়াতে অস্ত্রহীন চেঙ্গের মধ্যে ফসলের হলুদ সুমুদ্রে মিলিয়ে গেলে। চোড়ে। হাওড়ার ধৌরা তেজ মিলিয়ে যায়, মানুষের ক্ষুদ্রকোনায় ভেমনি চকিতে হারিয়ে গেলো তেজান্তরের অসীম শূন্যতায়। এক-বুক করল নির্জনতা নিয়ে পড়ে রেলো চোড় ছোট স্টেশনটা।

তবু যতক্ষণ ট্রেনের উৎক্ষেপ শব্দটি ছিলো। স্টেশনটাকে জীবন মনে হচ্ছিলো, কিন্তু জীবন আকাশের নীল ঝুল্লায় মিলিয়ে যেতে না। যেতেই নেমে এলো হৃদস্রো নিক্তকতাট।

সোনালী স্টে, আর গাঁথ নীল আকাশ—ছোটোই সীমাহান। অপার এই বিক্ষোভের মধ্যে লাল রঙের ছোট স্টেশন-ভারবন্ধটি হাঁটা দেখলে মনে হবে যেন তুলুর আচড়া আকাশের সালিয়া কোন শিলার বিষ্ণু করুণ একটা ছবি।

প্রতিদিন বেলা বারোটা আর বিকেল চারটের স্টেপের দিক থেকে ট্রেন এবং স্টেশনটায় হুমিনের জন্য দাঁড়ায়। একটা দৃশ্য এই চোর মিনিটই এখানে কর্মরত মানুষের মনে এনে দের চাঁদলা, বৈচিত্রের একটা নতুন অধ্যুতি।

প্রতিটা রেল-কামরাত্রি নানা শোনীর মানুষ, নানা ধরনের গোপালক। মুখুর্তের জন্য জানলা থেকে দেখা যায় ওদের ক্লাস—স্ট্রাই উদাসীন মুখগুলো। তাই প্রথম আবার টর্ডোরানি, বৈশির আওয়াজ আর কোলাহল স্টেপের বুক থেকে মিলিয়ে যায় বাস্ত কর্মসূচীর শহরের দিকে।

স্টেশনের কর্মী। এইসব মুখের দিকে সকোলুকে তাকিয়ে থাকে, ট্রেন চলে গেলে ওরা পর্যন্ত নিজেদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করে। ওদের চারপাশে স্টেপের নির্জনতা, মাথায় ওপরে চালু আকাশ, আর বুকের মধ্যে সেইসব মানুষের জন্য একটা বিদ্যমান, যার। প্রতিদিন তাদেরকে এই নির্জন প্রায়স্তে অবরুদ্ধ স্থে পাড়ি দিচ্ছে অজানা দুর্বলত।

প্লাটফর্মের ওপর টাঁচিয়ে ওরা। ফসলের হলুদ সুমুদ্রে কালো ফিতের মতো অপরুমান ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে থাকে। জীবনের ক্ষুদ্র চকলতায় ওরা এমনই মনে যেন মূক হয়ে গেছে।

রেল কর্মচারীদের প্রায় সবাই লেখায় উপস্থিত রয়েছে। মুখ্য ফুল, এলোমেলো পেলাই লোফ, লম্বা-চওড়া মানুষ, স্টেশন-মাস্টার। বাদামী ফুল,
ছাগলের মতে ছোট একটা দাঁড়ি, স্টেশন-মাস্টারের তরুণ সহকারী। বেঁটে, চট-পটে আর চালাক-চতুর স্টেশন-গার্ড, লুকা। ঘন দাঁড়ি, গৌঁড়ারা চেহারার সুচির্মান, দোলোনে পূর্ণ। স্টেশন-মাস্টারের বউ বেহে রয়েছে অফিসরের সামনে একটা বেথিয়ে। ছোটবাটো আর গোলগাল দেখতে। কোলে মুখেছে ছোট একটা বাছু, মুখ ঠিক মায়ের মতো গোল আর টুকুটুকে লাল।

স্টেশনটা ফসলের সময়ে সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবার পর স্টেশন-মাস্টার বউরের দিকে ফিরে তাকালেন। 'চারের সর্বশেষ সব তৈরি আছে তো, সোনিয়া?'

'হুঁ।' কোমল অখণ্ড প্রান বন্ধ সোনিয়া। ছোট করে বাখার দিলো।

'লুকা, জনিমস্থত সব গোছাচ্ছ করে ফালো। প্ল্যাটফর্মটা বাঁট দিয়ে নাও। ছাড়ে, হতভাগাগুলো কত মোংরা ফেলে গ্যাছে।'

'দেখেছি, মানবেই ইয়েগোরেফিচ।'

'নিকোলাই পেট্রোভিচ, চল হে, এবার একটা চা পান করা যাক।'

সহকারী ছোট করে জবাব দিল, 'চলুন।'

প্ল্যাটফর্ম চেংড়ে ওরা খাবার ঘরে প্রবেশ করলো। আদবাবপ্রতিটের বাঙ্গালা-বিহান সাদামাঠ একটা ঘর। 'দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বাসন্ত রঙের পোশাক-পরা কালো চুল শায়ালা মেয়েটা কুমিল লঙ্কা করেছে, পেট্রোভিচ? আমি তো বেলতা সীতিমত আকর্ষণীয়।'

'লিও পোশাকে তেমন কোন রুচি নেই তবু মন্দ নয়।' সহকারী জবাব দিলো।

নিকোলাই পেট্রোভিচ সব সময়েই খুব আত্মীয়ের সংশয় জবাব দেয়। কেননা রুচিসম্পর্ক শিক্ষিত লোক হিসেবে নিজের মনে ওর গ্রন্থ একটা অহংকার আছে। মাধ্যালিক বিচারের ভাষণ করেছে। ওর ছোট কালো একটা বাড়ানো খাটা আছে, তাতে বিখ্যাত সব মনোরঞ্জনের উত্সবি টুকে রাখে।

নিজের কাছে ছাড়া ওর সব বাণীর উপরে স্টেশন-মাস্টার ওর কর্তৃস্থলে মনে নেন এবং ওর মন্ত্রাগুলোকে মন দিয়ে শোনেন, বিশেষ করে খাটায় টুকের রাখ। উদ্দেশ্যগুলো তো বটেই। কিন্তু শায়ালা মেয়েটির পোশাক সম্পর্কে সহকারীর মন্ত্রণা মনের মধ্যে কোথায় মনে একটা খটকা লাগায় স্টেশন-মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? শায়ালা মেয়েদের কি বাসন্ত রঙের পোশাক মানায় না?'

কাচারের ডিস থেকে নিজের প্ল্যাট শোভা ভঙ্গিতে ধানিকাট। খাম চেলে নিয়ে সহকারী বললো, 'রঙের কথা আমি ভাবিনি, বলছি হাটের কথা।'
'ও, ছাঁট! সেটা অবশ্য আলাদা বাপার।'

ওদের এই আলোচনায় সোনিয়াও যোগ দিলে। কেননা এটা তার মনোমত বিষয়। কিন্তু কিছুটা মার্জিত রুচিসম্পন্ন এই ছাঁট মাঝের সঙ্গে আলাপ তেমন জমে উঠলো না, কেননা আরেকজনের সঙ্গে বিশেষ কিছুই বলতে পারলো না। জানলে দেখা যাবে সীমাহীন নিষ্ক স্তেপ আর সুন্দর এককালী অকাশ। একথা যেতে না যেতেই একটা মালগাড়ি এসে পড়লো। কর্মীর সবাই পুরনো, পরিচিত। গার্ডের নিদ্রাতুর, যেন অক্ষীয় তেপাঙ্গুর পাড়ি দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। কখনও কখনও ওরা পথ-পথ পর্যন্ত পুরনো গল্পের পুনরারোচিত করে। ওখানে একটা লোক কাটা পড়েছে। নিজেদের কাজ সম্পর্কেও গল্পগুলো করে। অমূর্তের জরিমানা হয়েছে, অমূর্তেকে অমূর্ত আয়াগু থেকে বদলি করা হয়েছে। এদের কাছে এই সব মুখোমুখী খবর নিতান্ত হেলাফেলার নয়, যত তুচ্চই হোক না কেন, সবাই তাই হোক করে গেলে।

দীরে দীরে স্তেপের ওপারে সূর্য আসতে গেলো, আকাশের গায়ে ছড়িয়ে দিলো খানিকটা গোলাপী রঙের আখির। অস্পষ্ট কামনার মতো সে আত্মার রঙিন হয়ে উঠলো সবকিছু। তারপর মুখ সুরমূখের মতো, সূর্যের শেষ রশ্মিটিকেও যখন মিলিয়ে গেলো পশিম দিকগতি, দীরে দীরে সমস্ত নামলো। আকাশে ফুটে উঠলো। টপ টপ করেকাটা তারা, যেন ঘুরে নির্জনতার ভয়ে শিউরে উঠছে।

সারা স্তেপ গাছে অন্ধকারে ঢাকা। রাত্রির ছায়াগুলো চারদিক থেকে ছোট স্টেশনটাকে নিশ্চেষ্ট দিয়ে ধরেছে। তারপর অতক্ষন নিশ্চেষ্ট রাত্রি নিজেই কোথায় পড়লো। গ্রামটিকে রুকুন।

স্টেশনে আলো আলো হচ্ছে। অন্ধকারে, উচ্চতে সবচেয়ে উজ্জ্বল যে আলোটা সবার আগে চোখে পড়ে তা হলো রিগলাণ্ডের ছোট সুবুজ বায়টা। মাঝে মাঝে ঘটা বাজছে, টেন আসার সংকেত দিচ্ছে। তার অল্পক্ষণ পরেই স্তেপের নির্জন অন্ধকারে চিরে ধরের আসে লাল একটা আলো, টেনের গর্জন। তারপরেই ছোট স্টেশনটি আলাদা অন্ধকারে চেক যায়।

স্টেশনের তথ্যাত্ন এই ছোট অভিজ্ঞতার সম্প্রদায় থেকে নিত্য শিশীরের জীবন বিচ্ছেদ। স্টেশন-গার্ডের লুকায় থাকে মাইল পাঁচেক ঘুরের একটা গ্রামে। সেখানে তার ছোট পরিবারের কাছে ছুটে যাওয়ার জন্যে ওর মন সব সময় পালায় পালাই করে। তাই ও অল্পক্ষণ সুত্রাস্থ গোমোঁজড়কে তার কাজটা করে সেদিন জন্যে অনুরোধ করে।
লুক। রেগে গেলে তাকে খেদে বুড়ো বলে ডাকতে। কেননা পারিহ ওপর বুড়োর দারুণ যৌক্ত। তার ছোট বাড়ির ভেতরে বাইরে নানান ধরনের পারিহ ঢুঁটা আর ঢাঁড়ে ঠাসা। সারাদিনই ওয়ানা ভিচিনিচির করে ডাকছে, মিষ্টি শিশ দিচ্ছে, বুড়োর নিঃসংখ্য জীবনকে ভরিয়ে দিচ্ছে মুখর ফলাফলিতে। বুড়ো তার সমন্ত অবসর সময়টা বায় করে এদের পেছনে। ফলে সহকারীদের ওপর তার কোন আকর্ষণ নেই বললেই চলে। লুকার সে সাঁপ আর গোমোজভকে পাত্তাপ বলে ডাকে, এবং মেয়েদের পেছনে লাগার জন্যে ওদের দায়ি করে।

লুক। সাধারণত বুড়োর বিদ্রোহে কানই দিতো না, কিন্তু বেশি দুর গজালে তুই-তোকারি করে গালমন্ড করতে। 'তুই তে একটা গভর্নর খেদে ইহুর, কর্ণের ছাগল চরাচরি। এতদিন শুধু মদুক নিয়ে বাঙ্গ তাড়িয়েছিস আর দৈনন্দিনীর বাধ্যক্ষণ পাহার দিয়েছিস। অন্যদের পেছনে লাগার অধিকার তোকে কে দিলাম। যা যা, তোর পারিহ ছানাদের খাওয়ানো যা।' এই ধরনের তিরস্কার থাকিক্ষণ শাস্তি হয়ে শোনার পর ইয়াগোদকা সোজা স্টেশন-মাস্টারের কাছে গিয়ে নালিশ করতে। অনেক জটিল সমস্যা। নিয়ে বায়ু স্টেশন-মাস্টার চিংকার করে ওকে তাড়িয়ে দিতেন। ইয়াগোদকা তখন স্টেশনের বাইরে এসে অঙ্গলতম ভাষায় গালমন্ড করতে, আর লুকাকে আঙ্গুল দিয়ে টোঁটাহাতে পালাত।

সোনিরা ছাড়া স্টেশনে আর একটি মহিলা আছে রাইগুনি এরিন। বয়স প্রায় চারটি, বত-কুঢিত দেখতে, বেশ চেহারা। গুলে-আসা। ভারি বুক। যেমন আগোছালো, তেমনি নোংরা, সারা মুখে বসন্তের দাগ। তার কুঢিত চেহারায় কেমন যেন ফ্রীডাসসুলভ একটি। বিনীত ভাব রয়েছে। যেমন সব সময় যুদ্ধ পুকুর ঠোঁটে সকলের সামনে নতজাহু হয়ে দর। ভিক্ষা চাইছে, অত্য মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। এই বছরধানকে গোমোজভ ও দিকে বিশেষ
গার্কির শেষ গল্প

কোন নজরই দেয়নি। কিন্তু একদিন গোমোজ্জুড় স্তৈশন-মস্তারের রান্নাঘরে এসে এরিনাকে করেকটা সার্ট বানিয়ে দিতে দিলো। এরিনা রাজি হলো, এবং সার্ট-গুলো হয়ে যাবার পর ও নিজেই গোমোজ্জুড়ের কাছে নিয়ে গেলো।

'ধন্যবাদ' গোমোজ্জুড় হাসলো। 'তিনটে সার্ট দশ কোপেক করে, তার মানে তিরিশ কোপেক আমার কাছে তোমার পাওন। রইলো, কেনন্তে?'

এরিনা ছোট করে শুধু বললো, 'ঠিক আছে।'

একটু চুপ করে থাকার পর গোমোজ্জুড় জিগেস করলো, 'কোন প্রদেশের মেয়ে তুমি?'

এরিনা একটককঠায় গোমোজ্জুড়ের দাড়ির দিকে অলক চোখে তাকিয়ে ছিলো, এবার বললো, 'রিয়াজান নাচ।'

'সে তো এখান থেকে অনেক দূর। এখানে এলে কেমন করে?'

'জানি না। আমি তো একানা আমার ঘরে এসে কোন নাই।'

'তা বটে,' গোমোজ্জুড় দীর্ঘাযাস ফেললো। 'এমন অবস্থায় মানুষ অনেক দূরে গিয়ে পড়তে পারে।'

চুজনে অনেককাক চুপচাপ নীরব হয়ে রইলো। শেষে গোমোজ্জুড়ই এরিনাকে একথা করে ভাঙলো। 'এই আমার কথাই ধরো। না কেন। আমিও একানা তিন কুলো কেউ নেই। অথচ একসময়ে নিজে নেভর্গোরদে আমার ঘর-বাড়ি, বাড়ি-চেলেমে সব ছিলো। বাড়ি মরলো। কলেরায়, ছোট বাচ্চাহারো মরে গেলো। রোগভোগে। আর আমি, আমি শুধু একা কেছ রইলুম শুধু নিয়ে। যেখানে কাজ করতুম, সেই কারখানাটা একদিন বন্ধ হয়ে গেলো। আর আমি ওঁর শরীরে পড়লুম। তারপর তুমি বহু বছর হয়ে গেলো এখানে এইভাবে কাটাচ্ছি।'

'মুহুরতের এরিনার বললো, 'নিজের বলে কিছু না থাকাটা একটা শাস্তি।'

'নিশ্চয়ই, শুধু ধ্বংসাবশেষ তুমি কি বিধবা?'

'না, কুমারী।'

নিজের সম্মুখে অভিযানকাকুকে চাপা দেবার চেষ্টা না। করেই গোমোজ্জুড় জিগেস করলো, 'এভাবে আর কতদিন চালাবে তুমি?'

'তাছাড়া আর উপায় কি।'

'তুমি বিয়ে করেনি কেন?'

'কে আমাকে বিয়ে করবে? আমার তো কিছু নেই। তার ওর যা বিচ্ছিন্নি দেখতে।'


‘হ’, তা বলে? ’ দাড়ি চুমরতে চুমরতে গোমোজত সকোচ্ছেকে ওর মুখের দিকে তাকালা। ‘এখানে কত মাইনে পাও?’

‘আড়াই কুবল।’

‘তা বেশ। আচ্ছা, রাজিরে এসে তোমার পাওনাটা নিয়ে যেও। দশটা নাগাদ এসো। আমি তোমাকে টাকাটা দিয়ে দেবো, অথ কিছু করার ন। থাকলে হঙ্কে মিলে চা খাবে। আমার হঙ্কেইতে। নিঃসঙ্গ। এসো, কেমন?’

‘আচ্ছা।’ শুধু এইটকে বলে ও চলে গেলো।

সেদিন ঠিক রাত দশটায় এরিনা এলো, আবার ভোরবেলায় চলে গেলো। এর পর থেকে গোমোজত ওকে আর কোনদিন আম্ভাঙ্গ জানানি নি ওর ত্রিশ কোপকেও ফেরেতি দেয়নি। এরিনা আসতে। নিজেরই গরজে। এসে নীরব নয় ভঙ্গে হঠাৎতে ঠাইজিয়ে মাঠকে। তার সামনে। আর গোমোজত বিচ্ছিনা। থেকে উঠে বসে ওকে বলতে, ‘বলো।’

এরিনা বসলে গোমোজত বলতে, ’দেখো, কাককালীতেও যেন টের না পায়, তাহলে কিন্তু বিপদে পড়বে। আমাদের তো আর সে-বয়স নেই, বুঝলে?’

এরিনা কেবল গাড় নেড়ে ছোট করে সায় দিতে।

আর ও বোধ চলে যেতে। রিপু করার জন্যে কিছু কাপড় গহিয়ে দিয়ে গোমোজত আবার সাবধান করে দিতে। ’দেখো, কেউ যেন না টের পায়।’

এইভাবে অনেকে চোখ এড়িয়ে ওরা পরস্পরে বাস করতে লাগলো।

এরার প্রতিদিনই রাতের এরিনা। লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে। তার দেখে, আর গোমোজত ওকে আবার প্রতিপাদ্য গোয়ে করতে। এতুর মতে। মাঝে মাঝে সে বলতে, ’আচ্ছা, কি মুখের ছহি।’

লঙ্কা গেয়ে এরিনা শুধু নমাজের হাসতে।

দিনের বেলায় ওরের ‘ছ’ জনের দেখা এখানে হতেই না। হঠাৎ করে কখনও সখনও দেখা হয়ে গেলে গোমোজত ফিসফিস করে জিগেস করতে। ’আজ রাজিতে আসতে তো?’

গাড় নেড়ে এরিনা সম্ভবত জানাতে।

সম্প্রতি না জানালেও ও যেতে একাকী অমুগতভাবে। বসস্ত্রের দাগভরা মুখে ফুটিয়ে তুলতে। একটা গালতীয়, যেন পরিত্র এই কর্তব্য সম্পর্কে ও সচেতন। অথচ বাড়ি ফেরার সময় ওর মন ভরে উঠতে। অপরাধা-সুসংস একটা আশ্চর্য।

মাঝে মাঝে ও এখানে নির্ভর কোন একটা কোশে বসে সেপ্টেম্বর দিকে অপলক
চোখে তাকিয়ে থাকতে, রাত্রির নিতল অন্ধকার আতঙ্কে আঘাত করে দিতে।

একদিন বিকেলের ট্রেন চলে যাওয়ার পর, স্টেশন-মাস্টারের ঘরের সামনে পল্লীর গাছগুলোর ছায়ায় বসে তিনজনে চা পান করছে। একজনের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে গার্মের দিনে ওর প্রায়ই এখানে বসে চা পান করে।

শুধু পেয়ালাটি তীরে হাতে ফিরিয়ে দিয়ে স্টেশন-মাস্টার কলায়ের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, ‘কালকের চাইতে আঞ্জ বেশি গরম পড়েছে।’

’তাস খেলতে পারলে মন্দ হতো না।’

’কিন্তু আমার তো। মাত্র তিনজন রয়েছি।’

’সোপনহাওর কি বলেছেন জানেন তে।’ সহকারী ভারিকা চলে জিজ্ঞেস করলে। ’তাস খেলা নামকর্মের মনের রিক্ততাকেই একাশ করে।’

’মনের রিক্ততা। বাঁঝ কথাটা। ভারি সুন্দর তে।’ স্টেশন-মাস্টার নিকালাই পেয়ারচিচের দিকে তাকালেন। ‘কে বলেছেন বললে?’

’সোপনহাওর। একজন জামান দার্শিনিক।’

’ও, দার্শিনিক।’

’দার্শিনিকরা কি করে?‘ সোনিয়া প্রশ্ন করলে। ’বিশ্ববিজ্ঞানে কাজ করে?

’স্পষ্ট করে বোঝানো মুখিল। দার্শিনিকরা কোন চাকরি করেন না, এটা যে বাদও নি। সত্যি বললে কি, যে কেউ দার্শিনিক হতে পারেন। যদি চিন্তা করার প্রতিভা নিয়ে জ্ঞান, বাঁশ সমন্ত ব্যাপারে কার্যকর যৌথার প্রকরণ আছে, তিনিই দার্শিনিক। বিশ্ববিজ্ঞানেও দার্শিনিক হারতে পারেন, সত্যি বললে কি, দার্শিনিক সব জোয়াগাতেই হারতে পারেন, এমন কি এই রেলের চাকরিতেও?‘

’আচ্ছা, বিশ্ববিজ্ঞানে বাঁশ কাজ করেন তো। অনেক টাকা মাইনে পান?’

’সেটা নির্ধর করে তাদের যোগাযোগে উপর।’

স্টেশন-মাস্টার দীর্ঘমাস ফেললেন। ’না, আর একজন সঙ্গী ধাকলে করেক দিনের দিবা কাটিয়ে দেওয়া যেতো।’

এরপর ও-আলোচনা আর জমলে না।

নীল আকাশের অনেক উজ্জ্বল, পাল্লারের শাখায় শোনা যাচ্ছে পাখি-পাখালির গান। ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এলো শিক্ষা কান।
স্টেশন-মাস্টার স্মৃতি জিজ্ঞেস করলেন, ‘ওর কাছে এরিনা আছে তে? ’
সোনিয়া জবাব দিলে, ‘হা।’
‘মেরেটার মধ্যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তুমি লেটা লক্ষ করেছো,
পেট্রোলিচ পানি, বিশিষ্ট তুচ্চতারই নামান্তর।’
স্টেশন-মাস্টার শখিশ চলকে উঠলেন। ‘তার মানে, তার মানে?’
কথাটা যখন বাড়া। কবর বোঝানো হলো যে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা অভাব, তখন মিনিট একটা আমার মুখে এলো। ওর ছু চোখের পাতা। আর
সোনিয়া মিনিট করে হাসলেন। ‘এট সব তুমিই করে মনে রাখে। বলো তো?’
‘আচ্ছা, তুচ্চতার কথাটা কে যেন বলছেন বললে?’
‘বারিয়ান্তিন্দ্রি, একজন বিখ্যাত কবি।’
‘ও, কবি! সাতা, এর। সব চমকের লোক।’ স্টেশন-মাস্টারের মুখে হুর্তে
উঠলো আমার প্রশ্নদের হাসি। ‘কিন্তু ইংলি, এরিনা সম্পর্কে আমি যা বলচ্ছি—
টি একটা অভূত জীব। আমি ওর সম্পর্কে বিখ্যাত না হয়ে পারি না। মনে
হয় কিসের আর ওর বুকের তেজরট। যেন চুরমার হয়ে গাছে—কখনও
হাসে না, গান গায় না, এমন কি কথা পর্যন্ত বলে না। যখন মাটিতে ধাড়-
করানো। কাঠের একটা উড়ি। অক্ষ কাঁকরের বেলায় তুবোড়। লেলিয়াকে ও
এমন ভাবে দ্বারে যে শিশুর জন্যে আমাদের কোন চিন্তাই করতে হয় না।’
‘থুর হয়েছে, গাঁছ।’ যদিও উনি জানেন সম্পর্কে অনেক বৃহত্তর কথনে
প্রশ্ন। করতে নেই এবং সেই জন্যেই কথাটা চাপা ঘরে বলেছিলেন, তবু
গোপন অস্বীকৃত সোনিয়া। ওর থামিয়ে দিলেন। ‘ওর সম্পর্কে অনেক ব্যাপারই
আছে যা তোমরা জানে না।’
পেট্রোলিচ হুর্তুচি কবর টেবিলে চামচে থুকে মুখ ঘরে ছড়া কাটনো।
লালী রে লালী, কেহনে তোরে বালোবাসি বল,
তোরে নিয়ে যে পালিয়ে যাবে। নাই কে সংল।
‘তার মানে, তার মানে?’ স্টেশন-মাস্টার চলকে উঠলেন। ‘ওকে নিয়ে
তোমরা বাঙ্গ করেছো?’
সহকারী কবর হেসে উঠলে। কথাল থেকে ঘরে পড়লো হুর্তুচিটা ঘাম।
‘মোটেই বাঙ্গ নয়।’ সোনিয়া প্রতিবাদ করলেন। ‘কুটির দিকে তাকিয়ে
দ্বারে, তাহলেই বুঝতে পারবে। পেট্রোলীচ আর তেতো। কিছু কেন?’
গফরির স্বেচ্ছাগ্রহণ

‘তা অবশ্য ঠিক, রুটি। যেমন হওয়া। উচিত ছিলো। তেমন হয়নি। হৈ।
এর জন্যে ওকে পোশাক বকতে হবে। কিন্তু হা ভগবান, আমি একটা আশা
করিনি! ওটা তো একটা ময়দার তাল! আর লোকটাই বা কে? লুকা?
আমার তা মনে হয় না, ওটা তে। একটা পাজির পাঙ্কা। নাকি সেই রুড়ে।
বদমাইটো!’

নিকোলাই পেট্রেভিচ সংক্ষেপে বললে৷ ‘গোমোজব ৷’

‘গোমোজব! ওটা তো নিতান্তই নিরীহ গো-বেচর৷ তুমি বানিয়ে বলছো
না তো৷’

এই আবিষ্কারে স্টেশন-ম্যাট্রাস সতিয়ে খুব খুশি হলেন৷ হাসতে হাসতে
ঠুরি চোখে জল এসে গেলো৷ তাবলেন প্রেমিক-প্রেমিককে থাকিনটা ধমকে
দিতে হবে৷ তারপর ওদের প্রেমালোকের দুঃখটা করলে ভেনে উঠতেই উনি
আবার হাসতে শুরু করলেন৷ শেষে উনি সবিস্তারে সব জানতে চাইলেন৷
নিকোলাই পেট্রেভিচ গতার হবার ভাব করলে৷ সোনিয়া তাকে থামিয়ে
দিলে৷ তবু অদ্যা স্টেশন-ম্যাট্রাস বললেন, হাড়তে বেরুন ছুটিকে নিয়ে আমি
একটা মজা করবো৷ এমন মজা করবে৷ যে৷

এমন সময় লুকা এসে জানালে৷ ‘টেলিগ্রাফে টরে টক্ক! করছে৷’

‘যাব্জি৷ বিয়ার্লিশ নয়রে সংক্ষেপ দাও৷’

তারপর উনি আর সহকারী অফিস ঘরে চলে এলেন৷ প্ল্যাটফর্মে লুকা ট্রেন
আসার সংক্ষেপ দেখতে বাঙালে৷ পেট্রেভিচ পরবর্তী স্টেশনে বিয়ার্লিশ
নয়রে ট্রেনটাকে পাঠালেন। বেতার-সংক্ষেপ পাঠাতে বললে৷ আর
স্টেশন-ম্যাট্রাস ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে করতে নিজের মনে হেসে
বললে৷ ‘তোমাতে আমাতে মিলে ওদের নিয়ে একটা দারুণ মজা করবো৷ কি
বলে৷ পেট্রেভিচ৷ আর কিছু না-হোক অন্তত প্রাণ খুলে একটু হাস। যাবো৷’

বেতারে সংক্ষেপ পাঠাতেই পাঠাতেই সহকারী দার্শনিকের ভঙ্গি বললে৷

‘তা অবশ্য মন্দ নয়৷’

এর কয়েক দিন পরেই ওদের সেই প্রাণ খুলে হাসার সুযোগটা এল০৷
সেদিন রান্নিয়ে এরিনা এল৷ গোমোজবের শেদে, এবং গোমোজবের
পরামর্শই এরিনা নানা। রকম ভাড়া কাঠের ঝুঁকুরের মধ্যে শখ। পাতলো৷
মেঝেটা ঠাপো আর স্যাতস্থাতে৷ ভাড়া চেয়ার, ফেলে দেওয়া টব, কাঠের
ব্যপ নিয়ে

তথ্য আর নানা রকম আংশিকতা জিনিসে উদামঘটনা ঠাস। অন্তকারে সেগুলো ভয়াবহ দেখাচ্ছে। অনেককপ ধরে সোহাগ আদর করার পর গোমোজন্ত কৃত্ত হয় পূর্ণিমা পড়েলো। এরিনা কিন্তু ভয়ে খুবতো পারলো। না, খেড়ের ওপর শুয়ে উৎপীড়িত চোখে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলে।

অনেককপ পরে গোমোজন্তকে জাগিয়ে দিয়ে ও কিসফিল করে বললো,

'এই, শুনছে।'

অধ্যাত্মবিদ্যা চোখে গোমোজন্ত জিগেলস করলো; 'কি ব্যাপার ছ?'

'ওরা আমাদের আটকে দিয়েছে।'

গুম-জড়ানো চোখে গোমোজন্ত লাফিয়ে উঠলো। 'তার মানে?'

'ওরা এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে।'

অতঃপর কোথে ওলে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গোমোজন্ত অন্তর্ভুক্ত হয়ে বললো,

'গালগ হলো না কি?'

'নিজেই গিয়ে দ্যাখে না।'

গোমোজন্ত দরজায় কাছে গিয়ে কয়েকবার গালগের মতো খাকা মারলো। তারপর বিষম হাম হয়ে বললো, 'নিয়ম এসব এই সৈনিক-ব্যাটালিয়ন কাজ!'

দরজায় ওপার থেকে ঢাপা হাসির আওয়াজ ভেসে এলো।

গোমোজন্ত চিক্কাত্র করে উঠলো, 'আমাকে বেরুতে দাও।'

ওপার থেকে রুদ্ধ। সুইচমান ইয়ারালকার জল। শোনা গেলো, 'কি ব্যাপার ছ?'

গোমোজন্ত আরো ক্রুশ গর্জন করে উঠলো, 'আমাকে বেরুতে দাও বলছি।

'কাল সকালে।'

'কি হচ্ছে এসব, আমাকে ভিউটিতে যেতে হবে।

'তেমন হয়ে আমি ভিউট করে দেবো, এখন ভেবে না আছো সেখানেই থাকো।'

সৈনিক ছালে গেলো।

'নেভি কুসুম কোথাকার।' ঢাপা বিষম হয়ে সুইচমান গর্জে উঠলো।

'তুমি এভাবে আমাকে কিছুতেই বন্ধ করে রাখতে পারে না। স্টেশন-মাস্টার যখন জিগেল করবেন গোমোজন্ত কোথায়, তখন তুমি কি বলতে শুনি ?'

ওপার থেকে কিংবা কোন সাড়া এলো না। এরিনা হতাশ ভঙ্গিতে বললো,

'আমার ভয় হচ্ছে স্টেশন-মাস্টারই হয়তো। ওকে দিয়ে এসব করিয়েছেন।'
গওরের শেষ গল্প

'স্টেশন-মাস্টার!' গোমোজভের ছুচোথে ফুটে উঠলো পতাক বিয়ে। 'তিনি এসব করতে যাবেন কেন? তুমি মিথ্যা বলছো!'

জবাবের পরিবর্তে এরিনা গৌঁড়ির একটা দীর্ঘস্বাস ফেললো।

'হা ভগবান, এখন যে কি হবে।' দরজার পাশে ওলটানো একটা চোখের উপর গোমোজভ এসে বসলো। 'এসব তোরই দোষ, জুয়ার-মুখো মাঘী।'

এরিনা কোন জবাব দিলো না। কেবল ওর বুক খালি করে বেরিয়ে এলো। করুণ একটা দীর্ঘস্বাস।

ছায়াছায়া কর্দম অন্ধকারে ধুলো আর নোংরার দূর্গন্ধ নাক তারি হয়ে উঠে। দরজার ফুল দিয়ে একফালি বায়ন জ্যোৎস্য। চূড়িয়ে এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। বাইরে স্টেশনের দিক থেকে ভেসে আছে মালগাড়ি যাওয়ার গম্বরে আওয়াজ।

'কিরে, কিছু বলছিস না যে?' চাপা ক্রোধে গোমোজভ ওমরে উঠলো। 'এখন আমি কি করবো? আমাকে এমন বিপদের মধ্যে ফেলে ইং-করে তাচ্ছিল কি? একটা উপায় বার কর না, হতভাগী! এ অপমান নিয়ে আমি এখন কি করে মুখ দেখাবো? হা ভগবান, কেন তুমি আমাকে এমন একটা জ্ঞান সঙ্গে জড়ালে?'

নম ঘরে এরিনা বললো, 'আমি ওদের আমাকে ক্ষমা করতে বলবো।'

'তারপর?'

'হয়তো ওরা তা করবে।'

'তাতে আমার কি? ওরা নাহয় তোকে ক্ষমা করলো। কিন্তু আমার তে! অপমান হলো, নাকি হয়নি? আমাকে নিয়ে হাসিঠাটঙ্গ ওরা করবেই।'

একটু নিশ্চিততার পরেই গোমোজভ আবার ওল গালাগালি দিতে শুরু করলো। হুঁসহ কিছুটা সময় কেটে যাবার পর এরিনা প্রক্ষণিত ঘরে বললো,' আমাকে তুমি ক্ষমা করো; তিমোকাবে পেতেন তিচ।'

গোমোজভ গর্জে উঠলো। 'বুঝল দেবে কুপিয়ে তোকে ক্ষমা করবো।'

আবার নেমে এলো। নিটোল নিন্তন্ত্রে তারি বোকা। যশ্রায় আত্মনাদ করে উঠলো। অন্ধকারে বদী ঘুটি মাঘী। এরিনা করিয়ে উঠলো, 'ওঃ, যদি একটু আলো থাকতো।'

গোমোজভ তড়ি উঠলো। 'থাম মাঘী! আমিই তোকে আলো দেখাচ্ছি!'

এরিনা আর কোন কথা বললো না। ডুঢ়পাতে ডুঢ়পাতে গোমোজভ
তোরের দিকে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভাঙলো। মোরগের ডাকে।
চোখ কচলে ফিসফিস করে বললো, ‘কিরে শুয়ার-মুখে, ঘুমিয়ে পড়েছিল?’
এরিনা দীর্ঘাসার ফেললো, ‘না।’
‘কেন?’ বিক্রিপ্ত তীক্ষ হয়ে উঠলো। গোমোঁজ্জের কঠিন বিলাপের মতো করুণ ঘর এরিনা বললো, ‘আমার ওপর রাগ কোরে না। তিনিকেই পেতে চেয়েছি। দোহাই তোমার আমাকে তুমি করোল। আমি নিঃসঙ্গ। তুমি ছাড়া এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই।’
‘চুপ কর! আর লোক হাসাস না।’
একটু পরে দরজার ছাঁক দিয়ে ঝলমলে এক ফাঁক তোরের আলো এসে পড়লো। ঘরের ভেতর। বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেলো, কেউ যেন চোখ পায়ে দরজার সমনে এসে পড়িলো। তারপর তালা খোলার শব্দ এবং স্টেশন-মাস্টারের ভারি গলার সব শোনা গেলো।
‘গোমোঁজ্জে, এরিনার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এসো।’
গোমোঁজ্জে অফুক ঘরে বললো, ‘চলো।’
এরিনা মাথা নত করে তার পাশে এসে পড়িলো।
দরজাটি সম্পূর্ণ খুলতে দেখে এবং গেলো স্টেশন-মাস্টারের সামনে পড়িতে রয়েছেন। এরিনাকে উঠু অভিবাদন জানালেন। ‘বন-মাটিতে আমার আন্তর্ক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বাড়িঝুঁট।’
বাইরে বেরিয়ে আসতেই কান-ফাটান। আওয়াজে হুঙ্কান ধরলো তোমার মাকে পড়িলো।
দরজার পাশে লুকা ভাঙা। একটা ক্যানসন্টরার টিন পেটাছে আর বুড়ো। সৈকত ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে শুরু। স্পুকতে। নিকোলাই পেতো-ভিচ গাল ফুলিয়ে মাথা হালিয়ে এমনভাবে ঠোক দিয়ে শব্দ করছে মনে হচ্ছে যেন ও সত্যিই ভেরী বাজাচ্ছে: পম! পম! পম-পম-পম-পম!
সময়ের তঁত্র এই একতানে স্টেশন-মাস্টার হাসতে হাসতে স্টিফটে পড়লো। গোমোঁজ্জের বিবর্ত বিবর্ণ মুখের অবস্থা দেখে সহকারীও হাসি চাপতে পারলো। না। তার পেছন মাথা নিচু করে এরিনা পাথরের প্রতিমূর্তির মতো নিচুল পড়িতে।
গোমোঁজ্জের দিকে তাকিয়ে লুকা ভয়ংকর মুখ-ভঙ্গি করে গেয়ে উঠলো:
এরিনা যা বলছে তার কানে কানে
যে-কোন পেরিয়ক্তি তা শুনতে ভালবাসে।
গফ্রিয় সিদ্ধ গল্প

বুড়ো সৈনিক তার শিক্ষার্থী গোমোজেরের কাছে একে আরও জোরে বাড়িয়ে দিলে, হাসতে হাসতে সেটেস্ট-মাস্টার চিংকার করে উঠলেন, ‘চলে এসো, ওর হাত ধরে চলে এসো।’

প্লাটফর্মের সামনের একটি বর্ধিতে বসে সোনিয়া। হাসতে হাসতে লুটো-পুটো বাড়িলে। এবার সে চিংকার করে উঠলে, ‘ওঃ! হামাও, হামাও! নাহলে আমি কিন্তু নিঃখ্যাত মরে যাবে।’

ভেরা বাধায়। থামিয়ে নিকোলাই পেত্রোভিচ এবার গান ধরলে।

ক্ষণিকের তের সবই চুং আমি সহিত। গো হাসি মুখে।

গোমোজের সিদ্ধিতে পা দিতে না। দিতেই সেটেস্ট-মাস্টার চিংকারে উঠলেন, ‘নবদ্বীপের নামে হররে।’ চাগরকুণই তখন সমস্ত চিংকারে উঠলে, ‘হররে।’

নত চোখের পাতায় এরিনা চলেছে গোমোজেরের পেছন গেছেন।

বুড়ো সৈনিক পাগলের মতো হেসে উঠলে। ‘চুম থেকে দাও কর্তা, ওনের চুম দাও।’

‘নব-বিবাহিতরা চুম খাও।’ সৈনিকি ভঙ্গিতে নিকোলাই পেত্রোভিচ আদেশ করলে। আর তাই শুনে সেটেস্ট-মাস্টার হাসতে হাসতে টাল সামলাতে না পেরে একটি উঁচির গায়ে থাকে। খেলন।

শিঙ্গ-ধরনির তালে টিন পিটিয়ে নাচতে নাচতে লুকা গান ধরলে।

এরিনা রেখে রেখেছে বাঁধাকপির ঝোল

এমনই ঘন, গলা তাঁ। দিয়ে নামের কিনা সনেহ।

নিকোলাই পেত্রোভিচ আবার সুর ধরলে। পম! পম! পম-পম-পম-পম! চাউনির কাছক্কাছি পৌঁছেছে গোমোজের অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আঁধিনী এরিনা শুধু, মাথো নিচু করে চুপচাপ বাড়িয়ে বইলে। ওর চারদিক থেকে সবাই তখন হাসছে, চেঁচাছে, শিয় দিছে আর উদ্যানের মতো নাচছে।

আঙুল দিয়ে এরিনাকে দেখিয়ে সেটেস্ট-মাস্টারের উড় স্তীকে বললেন, ‘বউকে ফেলে দর পালিয়েছে!’ কথাটা। বললেই উনি আবার বেদম হাসতে লাগলেন।

সোনিয়া বললে, ‘থাক, যথেষ্ট হয়েছে।’ এবার বেচারিকে চেঁড়ে দাও।

এখনও ভাবার সব কাজ বাকি।’

ছাড়া পেতেই এরিনা ধীর মন্ত্র পায়ে স্পেসের দিকে চলে গেলে। যেন ভাবার গতিরে হারিয়ে গিয়ে বনে-ইঁটা মায়েরের মতো। ধীরে ধীরে দিগন্তলীন ফসলের প্রান্তের ও নিঃশেষে মিলিয়ে গেলে।
সেদিন সেশনে হাসাহাসির পালাট। জবর হলেও মধ্যাকালের আসর কিন্তু মোটাই জমল। না। এরিনা ফিরে না। আসায় সোনিয়াকে রাধতে হয়েছিল। আবশ্য খাওয়া-দাওয়া একটু-একটু ধারাপ হলেই যে লোকের মন দম যাবে, এমন কোন কারণ নেই। কাজের সময় না হওয়া পর্যন্ত গোমোজড় আর ছাড়ি থেকে বেরুকি। কিন্তু বার হতেই সেশন-মাস্টারের অফিস-থরে তার তলব পড়লো। সেখানে নিকোলাই পেত্রোভিচ, মাত্রইই ইয়েগোরোভিচ আর লুক। ওর জন্য অপেক্ষা করছিলো। এবার অধীর আঘাতে তার। কি করে ‘রাপসিয়া’কে যে জয় করলো সে সম্পর্কে গোমোজড়কে জেরা শুন করলো। এ বায়ারে সেশন-মাস্টারের উৎসাহই সবচেয়ে বেশি।

‘সে এক বিশ্বী পতনবেলতে পারেন।’ মান হেসে গোমোজড় বললো। ও রুষতে পারলো, এরিনাকে যত হাসাহাসি করে তুলতে পারবে, উপহাসের হাত থেকে ও তত নিষেধে বাঁচতে পারবে। তাই ও মুখের মুখের হাসলো।

‘প্রথম এখন এরিনা আমাকে চোখ মারতে।’

‘ও হে হে, চোখ মারতে। নিকোলাই পেত্রোভিচ, একবার ভেবে দাখো।—এরিনা চোখ মারতে।’ উঃ কি সাংবাদিক ব্যাপার।

‘ও চোখ মারতে। আর আমি মনে মনে ভাবতুম তুমি বাছু ভালো। মতলবে নেই।’ তারপর একদিন বললো, ‘যদি চাও তোমায় কটা সাঁট বানিয়ে দিই।’

নিকোলাই পেত্রোভিচ সেশন-মাস্টারকে বয়ারাটিয়া বাখায়। করে বোঝালো।

‘নেক্রাসভের কবিতাটা জানেন তে।’ ছুটটা। আসল এখানে কোন বয়ারাটই নয়। তারপর গোমোজড়, বলে যাও।’

মিথের সুখোয় নিয়ে গোমোজড় যখন একটু একটু করে অমুক্ত্র হয়ে উঠেছেন, এরিনা তখন ফসলের সময়ের রাস্তা হয়ে শুরু হয়ে রয়েছে। পিঠ তোদের তেজ যখন অস্থির হয়ে উঠেছ। অমন সূর্যের আলোয় জলসানো আকাশের দিকে আর তাকাতে পারলা না, তখন ছুড়াসং যুধ চেকে ও উপর হয়ে গেলো।

ওর চারপাশে হাওয়ায় মরিচ হচ্ছে ফসলের কানাকানি, যেন লজ্জায় আনত হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে অগণন গুংকাড়িয়ের অশাস্ত ঋগ্রন। উত্তাপ আরও বাড়ছে। এরিনা প্রার্থন। করার চেষ্টা করলো, কিন্তু প্রার্থনার একটি
শক্তি ওর মনে এলো না । কেবল বিদ্রোহিত মুখগুলো নাচতে লাগলে ওর চোখের সামনে । তখনও ওর কানে বাজছে হাসির উত্তাল, শিংশিং নিঃ আর লুকার তীক্ষ্ণ কষ্ঠ। সব মিলিয়ে বুকের ভেতরটি । ওর ভারি হয়ে উঠলো ।

খালি রুকে ও সৃষ্টির দিকে মৃদু করে শুলো, ভাবলে এতে নিশ্চায় নিঃ সহজ হবে । কিন্তু সোদের তেজ ওর সারা শরীর ঝলমল দিয়ে, যেন ওর বুকের মধ্যে গরম কি একটি ঘুরে বেড়াচ্ছে । নিশ্চায় নিঃ কুট হচ্ছে ।

মাঝে মাঝে ও অন্যটি অন্তর্নিদ্রা করে উঠছে, ‘প্রস্ফু, দয়া করো’ এতে কিছুই শোনা যায় না । মাঝার ওপরে সামাহিনি নিঃজীবন আকাশ আর এই নিখর্ষণাত্মা পৃথিবীতে ও এক । সম্পূর্ণ নিঃঘন্য এক । ওর এই নিঃঘন্যতার বোঝা। নামিয়ে দেওয়ার মতো । কেউ নেই ।

সন্ধ্যার দিকে অনেক অনেক দূর থেকে ও চিংকার শুনলা । ‘এরিনা !’

এই এ রিনা ! আছে। বোকা। মেয়ে তে।’

একটি কঠিন লুকার, অন্যটা বুড়ো। সেইদিনের । এরিনা ভেবেছিলে। সূর্যীয় অর একটি কঠিন তাকে ভাবছে। কিন্তু ভাবে না। । বুকের ভেতরটি ওর যশ্মান্ত করিয়ে উঠলো।। অর্ধ ধারার চোখের জল বসন্তের চিফার রুক্ষ চিঙ্ক বেয়ে টগ্টপ করে ঝরে পড়লো। ওর নগ রুক। আর কৃদতে কৃদতে এরিনা ভোল মাটিতে নরম বুক ধরতে লাগলো, যাতে বুকের ভেতরের তীর দহনন্তে ও নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারে। সারাক্ষণ অর্ধ ধারায় ও কেবল বেঁধেই চললো।। তারপর এক সময়ে কান্ত। নামিয়ে উঠে বসল।। যেন ভয় পেলো। পাছে কেউ এদে ওকে কৃদতে বারণ করে ।

রাত্রি যখন গাছ হলো, নিঃশব্দ পায়ে ও কাঠের দিকে ফিরে চললো।

শেষের পেছনে অস্কার ছায়ার চুপচাপ দাঁড়িয়ে এরিনা। অনেকক্ষণ স্তেপের দিকে নির্মিতে চোখে তাকিয়ে রইলে।। একটা মালগড়ি এলো আবার চলে গেলো।। এরিনা জুনতে পেলো বুড়ো সেইক রেলকম্যুনার কাছে তার লজ্জার কাহিনী বলতে, আর তা জন্ম। হেসে মুঠোপুঠো ধর্ষিত। ওদের সে হাসির গলিত তরঙ্গ হাওয়ায় ভেসে ধর্ষিত্রত্নিত হচ্ছে স্তেপের দূরে-দূরাস্তে।

‘প্রস্ফু, দয়া করো’। দেওয়ালে পিঠ চেলে এরিনা। গতিতপ দীর্ঘমায় ফেললো।

কিন্তু দীর্ঘমায় তার বুকের বোঝা। এতটুকু হালকা হলো না ।
শেষ রাতে স্টেশনের সবচেয়ে উঁচু চিলেকোঠায় উঠে ও গলায় দড়ি দিলো।
হুদিন পরে লাসের দূর্গন্ধে এরিনাকে খুঁজে পাওয়া গেলো। প্রথমে সবাই ভয়ে
পেয়েছিলো। পরে এ ঘটনার জন্যে কে দায়ী সে নিয়ে তারা আলোচনা শুরু
করলো। নিকোলাই পেট্রোভিচ অভিযুক্তভাবে প্রমাণ করলো যে এর জন্যে
গোরোজভই দায়ী। প্রতিবাদ করার কোন রকম সুযোগ না দিয়ে স্টেশন-
মাস্টার গোরোজভের চোখালে ঘুষি মেরে তাকে রা কড়াতে নিষেধ করলেন।

পুলিস এসে জোর তদন্ত করলো। জানো গেলো। এরিনা বিষাদ-উম্মাদনায়
ভুগছিলো। কয়েকজন ক্রোকটচারীকে লাসে স্টেশ নিয়ে গিয়ে পূঁতে ফেলার
আদেশ দেওয়া হলো। এইসব ঝামেলা মেটাতে পার স্টেশনের আবার মাত্র- শৃঙ্গলা ফিরে এলো।

এরপর থেকে স্টেশনের বাসিন্দারা চারামনিট ছাড়। বাকি সারাট দিন
বিষমতায় অস্থির হয়ে ক্রান্তু বিমর্শ থেকে ছুটে যাওয়া। ট্রেনটার দিকে অপলক
ভাবিয়ে ধাক্তো। আর শীতকালে, স্টেশনের। নর্জন প্রাঙ্গ থেকে বহে-আসা
দৃশ্য মুখর-ঝড় যখন আছড়ে পড়তো। ছোট স্টেশনটার বুকে, জীবন তখন
মনে হতো কি ভীষণ নিষ্ফল হিমেল।

১৮৯৭
কেন্নু ও অভিনয়ম

কেন্নু ছাটখাটো। চেহারার একজন ইহুদি। শীর্ষ শরার, বিষন্ন মুখ, ধূতনির ওপর লালচে চুলে দাঁতি, মাথায় কপালের ওপর পর্ণম টানা নাম্বরা একটা টুপি।
টুপির নিচে উজ্জল ধূসর ছুট। চোখ, লালচে সরু আ, হঠাৎ দেখলে মনে হবে
যেন তুলি দিয়ে আঁকা। চঞ্চল ভীরু চোখের মহিষী। কোন সময়ই স্বয়
থাকে না, অনবরত একাধিক উদিক যুক্ত, যেন কোন কিছু দিকে বেশিখণ
তাকিয়ে থাকতে ও ভয় পায়। পাতলা ঠোটে সারাখণ্ডেই ঝড়িয়ে থাকে নিশ্চয়
বিনাশ একটা হাসি।

তা বলে ও অলস বা বোকা নয়, বরং যেমন চালাক-চতুর তেমনি চটপট।
কিন্তু হল কি হবে, ছাটখাটো এই ইহুদির প্রতি মানুষের নির্মম নিঃিক্ষুর উপহাস
বিজ্ঞাপকে ও সত্যিই ভয় পায়। তখন ওর শরীরের সীমান। চাড়িয়ে কান্তিকে
কাপড়ের তৈরি চিলে বহিবাসের প্রতি। ভাঙ্গা ভাঙ্গা পর্ণম চাড়িয়ে পড়ে
নিশ্চয় একটা অত্যন্ত, মাথা থেকে পায়ের পাতা। অপর ধরনের করে কাপড়ে
থাকে সায়। শরীর।

ওর আসল নাম কেইম আরোন পারভিজ, কিন্তু সবাই ওকে ঠাট্টো করে ডাকে
কেন্নু বলে। অনেকের ধারণা এই নামটা ওর ছাটখাটো। ভীরু ইহুদি-চরিত্রের
সঙ্গে যেমন সুন্দর খাপ খায়, তেমনি অপমানের চূড়ান্ত।

ও বাস করে দূর্বলোচে হাতে মার খাওয়া সেই সব মানুষের সঙ্গে, যারা
প্রতিবেশীদের ক্ষতিসাধন করে অনাবিল আনন্দ পায়, যারা নিজেরাই নিজেদের
ওপর প্রতিহিংস। চরিত্র করে, আর সবচেয়ে বড় কথা—ওরা জানেও তা কি
করে করতে হয়। ওরা যখন ওকে ঠাট্টো বিষ্ণু করে, কেন্নু কিন্তু সারাখণ্ড
ঝাঁ ঠাট্টো হাসে। কখনও কখনও ওদের সেই মজার খেলায় ও নিজেই অংশ
গ্রহণ করে, যেন এ সবের জন্যে উৎপীড়কদের ও আগে থেকেই অনুযায়ী দিয়ে
রেখেছে।

পেশায় ও ফেরিওলা। গলায় কাঠের একটা বাম্ব ঝুলিয়ে শহরতলির
দরিত্রতম অঞ্চলে নাজান কিছু ট্রেক্টে কাফি করে বেড়ায়। সিকানের
সংকীষ্ঠ বিজ্ঞ গলি দিয়ে হটয়ে হটয়ে ও হটে, 'চুমুরো পালিস, দেশলাই, চুমু-সুতো, চুলের ফিতে কোটা চাই-ই।'

গলির চূপাশে জীবন পুরনো। জীবন সব উচু-উচু বাড়ি, সরাইখানা। রাজিরে
কেন্দ ও আতিথয়ম

কেন্দর জন্য ডাঁড়ায়-বর, রুটির কারখানা, পুরুনো লোহালক্ষুড় বাসন-কুলি কেন্দ-বেচার দোকান। সব সময় পকেটমার, চোর-বাটপাড়, মাতাল, নাবিক-কেন্দ প্রশিক্ষক, চোরাই মালিক কেন্দ-বেচার ফোঁড়ে, পুরুনো জামা-কাপড বিক্রেতা আর বেশাদের দালালদের ভিড়ে গিঙ্গিঙ্গিয় করছে। নানান সুরে ফেরিওলালদের টিকার, নোংরা। আর্বর্ণনার চূর্ণিক, পিয়াজ-রসুনের চড়া ড়ি আর মেয়েরের টকসা গঠনে বাতাস ভারি হয়ে থাকে। এখানে ভোরের দিকে সামাজ্যা একটুকুরের জন্যে যানের মুখ দেখা যায়, তারপর তার আর কোনটিকেই দেখা যায় না, যেন গলির ভেতর থেকে চুকিয়ে ভয় পায়।

চিকারে চোলামেচি, অশীল খিংসি আর নরকের পিপিপাকানো এই ভিড়ের মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছুটুকুটুটি করে, ভিক্ষা করে, হাদের কাছে যায়। চুরি করে, রাত্তিরে যেখানে রাতে শুয়ে থাকে। তাদের বাগ-নামান কোন ঠিকানা নেই—যেমন অবস্থান নাংরা, তেমনি রাম-বিচ্ছু। এই সব গলির মধ্যে দিয়েই হাকতে হাকতে কেন্দ মেয়েদের কাছে তার সওদা ফেরি করে। কুড়ি কোপেকের জিনিস-পত্তা ধার দিলে বাইশ কোপেকে ফেরত পায়। না, মেয়েরা কখনও ওকে ঠেকায় না।

সেদিক থেকে দেখতে গেলে অবান্দ্যদের তুলনায় কেন্দের ব্যবসা নিতান্ত ফেলেনা। নয়। কখনও কখনও মেয়েদের কাছ থেকে ও পুরুনো ছেঁড়। সাত শুটি বুট বায়। নিউজ অক্ষরায়, সত্য দামের বুট। গলায় কেন্দ। তার বদলে তিনিদের।

তারপর পুরুনো। কোন সামগ্রীও না। দশ কোপেক লাভে আর দোকানে বিক্রি করে দেয়। এভাবেই কখনও মাঝে মাঝে ও লোকজনের হাতে মারাধোর হয়ে, কখনও কখনও সবাই ওর জিনিসপত্তার ভিজিয়ে নেয়, তবু ও কখনও মুখ ফুটে প্রতিবাদ করে না, বরং করণ তার মুখে সারাসুর কেবল মুখি মুখি হাসে।

হয়তো কখনও এমন হলো, শহরতলির নির্জন অদ্বিতীয় কোন প্রাণে চূরনম্রন ছোকরা এসে হঠাৎ ওকে ধরলো, ভয়ে হোক বা ঘুষিতেই হোক কেন্দ সঙ্গে মাতিতে পড়ে যায়, পড়ে গিয়ে পকেট ছুটে। চেপে ধরে মিষ্টির মতো। করণ বরে চিকার করের, ‘দোহাই ভাই তোমাদের, আমার সবকটা পয়সা নিয়ে নিয়ে না, তাহলে আমি কেমন করে বাচা করে বলে।”

করণ মুখে ওর মিটি হাসিটুকু দেখে কেউ হয়তো। বলবে, ‘ঠিক আছে, তীরিষ্ট। কোপেক দাও, আমারা তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।’ তারপরেই হয়তো।
গাকির নেত্রে গল্প

দেখা যায় কেন ওদেরই সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করতে করতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটার পর ওকে যেন আরও বাচ্চা দেখায়।

কখনও কখনও পুরুষের চোখে চোখ ফুটতে ভুলে যান, ওকে রাগায়, পচাব। লেকুঠি তৃষ্ণাজনক খোলা ছুঁড়ে মারে। এরকমের ও ভালো কথায় ওদের বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় না। তখন প্রায়ই ওকে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে হয়।

সবাই ওকে চেনে, সবাইর ওর ওপর অত্যাচার করে। এরকমের মধ্যে রয়ে পুরুষের কঠিনতা ও ফেরি করে দেয়াল, অজ্ঞতা চুক্তির মধ্যেও মিষ্টি করে হাসে। এখনি তার সাথে সিকানের এ প্রায়শঃ কেনও দিন কাটে।

সিকানের অন্য প্রাচীন সাস করে আতিকাম। যেখান দেখাের মতো বিশাল চেহারা; তেমনি অপূর্ব সুদৃশ দেখতে। মাধবপুরী কৌকড়ানে। কৌকড়ানে।

কালো চুলার মুখের বদলে, বাদামের মতো বড় কচ্চুকে কালো চোখ। খুব খাড়া না, হালকা। গোলাপী ঠোঁট, এক ছোটাড়া পাকান। কালো পোঁট। পাখির কোল। প্রতিমূর্তির মতো। বিকট দেহের পায়ে মানান-সহ বাবুমার শরের অন্নত্র একটা মুখ, চোখ। বুক, ঠোঁট চরম সবসময়ই লেগে রয়েছে পরিতৃল্প অথচ কেনা যেন একটা অবশাস হয়।

সিকানের সবাই ওকে যেমন যেমন মতো। ভয় করে, মেয়ের। আবার তেমনি ওকে দারুণ পছন্দ করে। বছর পুরনো বয়স, অথচ এখন অনন্ত রকমের গায়ের জোর, এখন কর্ণেল পোরুষটি। চেহারায় তার জীবন ওর কখনও খোটে খাবার দরকার হবে না। আর একবর্ষের তার হয় না।

সিকানের মেয়ে-ফেরিওয়ালার, দোকানী আর বেশীরা। ওকে ভালো। ভালো খাবার, মদ আর তামাক জোগায় এতেই ওর চলে যায়। এর বেশি কিছু ও আর চায় না।

ওর জন্যে মেয়ের। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, ওর অপরকের কাহিনী সাহায্যের কাবে গিয়ে পৌঁছায়, আমারা বড়োদের ধরে নির্মমভাবে পেটায়।

আতিকাম এর ব্যাপারে কখনও নাক বলায় না। পাহাড়ের বাঁধে নারীর ধরে বোকাও নিজেদের টান্তায় করে মেলে গিয়ে ও লুপ্তচাপ ঘুরে থাকে। নীরব ওপর নিম্নহার সরুক সাজা, চাবুক, হয়ে মিশে গেছে নিজস্ব গায়ে, মাঝে মাঝে চোখে পড়ে হু-একটা গেম। নিচে বিস্মিত পাহাড়ী পথে একবারের চলে গেছে সোজা। নরকক্ষুরের দিকে। এখন থেকেই শহরতলির গুঞ্জন স্পষ্ট শোনা যায়। তুষ বড় ঘাস, দীর্ঘ করেকটী বাঁচ আর এক্ষুদ্ধ খোলে জায়গাটি।
তিন দিক থেকে এমন ভাবে ঢাকা আর নির্জন যে রাস্তা থেকে চট করে চোখে পড়ে না।

কখনও কখনও গুল্ম-বদমাইন্স বদহারা এসে ওর এখানে আড়া। ঝামায়, তাঁর পেটে, জুয়া খেলে, ক্ষম বিছিয়ে ঘুমোয়। তা বলে ওর যে অতিশয়কে খুব ভালোবাসে, তা নয়। অমিত শক্তির জন্যে ওর যেন অতিশয়কে হিংসে করে, অতিশয়কে তেমনি ওদের শরুপ দৃষ্টান্ত করে। ফলে মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া কুটি ও যেমন ওদের সঙ্গে ভাগ করে খায় না, তেমনি গলায় গলায় দোকান বলতে যা বোঝায় তাও কারুর সঙ্গে নেই। তবে কেউ যদি থেকে কথা বলতে চায় বলে, কেউ যদি মদ খাবার পরদিন চায় দেয়, কখনও ওদের সাথে এক সঙ্গে মদ থেকে হৈরান করে না।

যত্ন পর্যন্ত না কেউ এসে বিকল্প করে, অতিশয় কোপের আড়ালে চুপচাপ শেষ থাকে। কেউ বলতে না নারী চেড়। পোশাক-পরা সাত-আট বছরের ছোট বাচ্চা, খুব মেশিয়ে হল বছর দশ বছর বয়স, সংবাদের শুধু সম্পর্কে একজন পর্যন্ত যাদের কোন চেতন। হয়নি, সন্ত্রক্ষণ পারে ভুট ভুট এসে ওরা ফিসফিস করে বলে, ‘অতিশয় শুঁড়ে। মারিয়া-শুঁড়ি আমাকে বলতে বলছে ওর যাঁরা বাইরে কোথায় বেরিয়ে গেছে, তামাকে আজ একটা নোচে ভাড়া করে রাখতে হবে।’

‘ও, তাই বুঝি।’ ঘুম-চড়া নীলের চোখের পাতাতুটো। অতিশয়কে কোন রকম টেনে তেলে। ‘আচ্ছা, ঠিক আছে। না, তার আগে বলু তো বিচ্ছু, তোর মারিয়া-শুঁড়িকে কোন দেখেছে, কোথায় থাকে?’

‘বারে, ওই তো শহরে রাস্তার ধারে যার দোকান রয়েছে।’

‘ও, বুঝেছি! পুরুষে লোহালোহের পাশের দোকানটা তো?’

‘না না। আমি নিরাকারেনার পাশের দোকানটা।’

‘ইন্দিরা, এবার বুঝে পেয়েছি। তাছাড়া মারিয়াকে আমি খুব ভালো করেছিলি, তোর সঙ্গে এমনি ঠাকু। করছিলুম।’

তবু অতিশয়কের মুখ দেখে সংবাদবাহক পুরোপুরি আহ্মত হতে পারে না, তাই বিচ্ছ বাখা করে বলে, ‘মারিয়া-শুঁড়ির দোকানটা মাছের দোকানের ঠিক পাশে, গোলগাল লাল মুখ, লম্বা মতন...’

‘ঠিক ঠিক, মাছের দোকানের পাশেই তো গোলগাল লাল মুখ...আর, না না...তুই কি ভাবছি আমি গোলি ফেলবো তা করে না না! যা, তোর মারিয়া-শুঁড়িকে বলে আমি একটা পরেই বাছি।’
গফির শেষ গলা

‘আমাকে একটা কোপেক দাও, অতিয়ম যুড়ে।’

‘একটা কোপেক! ঘুড়ঝ়াই, দেখিছি আছে কি না।’ দুপুরে হাতে ও কিছু না কিছু ঠিক বার করবে, আর বিচ্ছিন্ন তখন হাসতে হাসতে তাঁর মতা ছুটে গিয়ে সোজা ধামে যক্ষ-বিক্ষেপ। মারিয়া-পুড়ির দোকানের সামনে। যথাযথ খবরটা ওকে পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে কিছু না কিছু বলবিগম্ভীর করে ছাড়বে। কেননা সিগারেট খাওয়া, তদকা কেনা ছাড়াও ছোটখাট কিছু ভাবে। তখন তার ছোট মাথার মধ্যে যত্নের মত। ভেসে বেড়ায়।

আর এমনি কোন ঘটনা ঘটনার পর অতিয়ম যেন আরও বেশি নিলিপ্ত-আরও দুরধিগম্য হয়ে ওঠে। তবুও ওই চার পাশে নিঃশব্দে ঘনিয়ে ওঠে হিংসা। আর বিদেশের ঝোড়া মেয়ে, শক্তর কালো ছায়া। অতিয়ম কিন্তু জাকেরথেকে করে না, নিজের এর এই শক্তির জোরে ও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বিপরীত পাহাড়ি পথ ধরে ও বীরে ধীরে শহরতলির দিকে এগিয়ে আসে; মন হয় ঠিক যেন ভরসার একটা মেঘ ঘেঁষে আসছে! বলেও যে তাকে এগিয়ে আসে চোখের মাণ্ডিটে। ওর তত অন্তর হয়ে চারদিকে ঘোরে, নাসারক্ত ছুটে। ও ঘন কেঁপে ওঠে। শহরতলির সবাই ওর মুখ দেখে রুঝলে পারে ও এখন কোন মেঝানে রয়েছে। ওর চোখের মাণ্ডিটে ওই ভাবে ঘুরতে দেখলেই চাপ। একটা সতর্ক কানাকানি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ‘এই, অতিয়ম আসছে।’

সবাই তখন তাড়াতাড়ি গলির ছুড়ার থেকে তাদের বেচাকেনার জিনিস-পত্তর সব গুটিয়ে নেয়, নিয়ে সম্প্রতি তার সামনে ধাঁকের হাসি-হাসি মুখে তাকে আদর অভাবার্থনা জানায়। অতিয়ম কিন্তু তার বাকিন্তু তার চর্চায় শক্তিকে ভয়-পাওয়া। এইসব মামলার মুখের দিকে ফিরেও তাকায় না, নিঃশব্দে গভীর মুখ ধারে ধীরে যায়। ও যেন অর্থের মধ্যে অমিত সৌন্দর্য নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কোন বন্ধ পড়।

পায়ের ধাক্কায় ঝুঁকিতে রাখা অঞ্চল, ফুসফুস, যক্ষগুলো। কাদামাথা রাস্তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে যদি ওকে বিজেগে কর। হয়, ‘কেন ভুমি এগো। ফেলে দিলে?’

থেমেগলায় ও তখন বিজেগে করবে, ‘আমার পায়ের সামনে এগো। কেন রাখলে?’

‘কেন, এটা তোমার একার পথ নাকি?’

‘ধরে, এখান দিয়েই আমি হঠাৎতে চাই।’
কনুন ও আতিথ্যম

‘ইঁটার জন্যে তে। এই এটা পথ দেওয়া রয়েছে, তাতেও তোমার হয় না’?

প্রচণ্ড রেগে যাওয়া সত্ত্বেও আতিথ্যমের চোখের মণিছটোকে স্তির হয়ে আসতে দেখে ফেরিওয়ালা। থমকে যায়। আতিথ্যম আবার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। ফেরিওয়ালা। তখন চায়ের দোকান থেকে গরম জল চেয়ে এলে তার জিনিসপত্তর গুছে বুঝিয়ে সাজায়। হঁ-একমিটি পরেই শোনা যায় পরিত্রাহি চিত্কার, ‘ধরতি, ফুসফুস...ধরতি! চলে আসুন, চলে আসুন! মাত্র পাঁচ কোলাকে! চলে আসুন!’

চিত্কার দেখায়ে হাসি১-ঠাটায় সারা। গলি তখন গম্বর করেছে। মাছ মদ মাংস ধাম আলকাতার। আর পিয়াজে ঝাঁকালো গঠন। মাথায় ওপরে এক চিলতে ধূসর আকাশ।

‘চট্ট মুতে। ছুলের ফিতে কিটা চাই!’

আতিথ্যমকে দেখে অন্যদের চাইতে বেশি কেঁপে ওঠা কেনের সরু গলা।

‘নাশপাতির চান্টি! কিনুন! চাহন! নাশপাতির চাটনি!’

‘পিয়াজ, পিয়াজ, সবুজ পিয়াজ চাই!’

‘কাভাস! কাভাস!’ লাল-মূল বেটে খাটে। একজন বুড়ে। পিয়াজ পালায় বঙ্গো রায়ের মদ বিক্রি করছে।

অন্য একজন, সবাই তাকে ল্যাংটি-বর বলে ডাকে, কিনের ওপর এক-গাদ। পুরনো সার্ট ফেলে বিক্রি করছে। ডক-শ্রেষ্ঠকরা তাকে ঘিরে ধরে দর-কষাকষি করছে। একজন শ্রেষ্ঠ রেগেমেগে বলছে, ‘কি হে ছোকরা, এই সার্টের দাম কুড়ি কোলাকে! কুড়ি কোলাকের সার্ট পরে বড় লোকের বিধবা-বউকে বিয়ে করা। যায়, বুঝলে হে!’

পরমুচ্ছেদি শালাত চিত্কারে কেঁপে উঠে বার। গলি, ‘একটা প্যাসা দাওগো। বাকু আমরা। অন্য অন্য নাচার!’

‘এই যে, আতিথ্যম! রাত্রিতম বাস্ত্রীচাহন। পাঁচিঃ বিক্রেতা। দারিয়া গোমোতি। আন্তর্জাতিক বঠিতে গাঁথের বিজেল করে, ‘কি বাপার এতদিন কোথায় ছিন্ন মেরেছিল। আমাদের তো তুমি একদল ছুলেই গেছে। দেখছি!’

‘আর না না, ছুলবে কেন?’ পা দিয়ে ওর পাঁচিঃগুলো। মাটিতে ফেলে দিয়ে আতিথ্যম শান্ত করে বলে, ‘তাতেপর তোমার বাবার পাতিকে কেমন চলছে?’

দারিয়া হাউমাই করে কুঁড়ে ওঠে, ‘থুনে, নিচুনায় বেহায়। কোথায় তোমার মতো। আত্রিকারের উচ্চতাকে লোকে কি করে মন করে!’

১০
চারদিকে তখন হাসির রোল পড়ে যায়। সবাই জানে আত্মিয় যেমন দারিয়ার কমা চাইবে না, তেমনি ওকে আবার কিছু বলবেও না। মুক্তি হতে লোকের পা মাঝে সবাইকে কমুকি দিয়ে গৌতা দিতে দিতে আত্মিয় ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়, আর ওর আগে আগে ছড়িয়ে পড়ে সেই মরমির কানাকানি। ‘এই, আত্মিয় আসছে!’

এমনকি যারা কখনও আত্মিয়ের নাম পর্যন্ত শোনেনি তারাও পৌরুষদীপ্তএই তরুণ দৈত্যদের জন্য ভয়ে পথ ছেড়ে দেয়। আত্মিয় কোন আজাদখানায় প্রবেশ করে, ওর পরিচিত বন্ধুরা হাত বাড়িয়ে ওকে সাদর অভাির্ন। জানায়। আত্মিয় তখন এমনভাবে তার হাতটা চেপে ধরে যে বেচারী সত্যির অন্তর্নিদ্র করে ওঠে। ও যখন ব্যক্তিরাও কারুর কাছে হাত রাখে, তার দম যখন বন্ধ হয়ে আসে, যশ্চার্য ছাড়াও করতে করতে সে গুজিয়ে ওঠে, ‘আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি, জলাদ কোথায়কি?’

জলাদ কিন্তু নিয়ির্বাক।

এই ধরনের অমানিয়দীর দূর্বলহারের জন্য সিকানে আত্মিয়ের শক্রসংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ওর প্রতিকৃতিতের দূর্গর্ভে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারেনি। সত্যই ও যেন নিজেই নিজের অমির শক্তির জীবন্তী। একবার কোন এক দোকানি গ্রামে নিদর্শন মরমাত্ত হয়ে শহরের কুঠান্ত এক কসাই-শান্ত ভাড়া করেছিলো। এক প্রথম পুরুষের বিনিময়ে কসাই একাই আত্মিয়কে একটু সমক্ষে দেবার দায়িত্ব নিজের কাছে তুলে নিয়েছিলো। কিন্তু হায়ার কথা—অচিরেই দেখা গেলো। আত্মিয়ের একটা ঘুঘুতে বেচারী অভািন হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে; একটা হাত তার দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এতে নিস্বাসের কথা-শিবিরে আত্মিয়ের সম্মান বেড়ে গেলো। বই কমলো না। পুলিস-কাজীদেরও সবাই আত্মিয়ের আমাদুমিক শক্তি দেখে চমকে উঠলো। ওরা আগেই আত্মিয়ের ‘কাহিনী’ কিছু কিছু জেনে ছিলো, বলে। করেই জনত আত্মিয় আর যাই হেক অন্তত চোর নয়। না, এত চালাক সে নয়, বিভূতি মেয়েদের প্রতি ওর যা। একটু দূর্বলতা আছে। না, এটাই সম্পূর্ণ সত্যি নয়, বরং মোহনার্থ দূর্ভলতা ওর ওপর তার চাহিয়ে দেখ। বাল্যকালের গল্প বর্ণিত কোন নায়িকার মতো শক্ত সবল মহিলারা ওকে পল্পটী ঢেকে রাখে, নিজেরে সেবায় করে, বাহার করে। আর তখন আত্মিয়কে মেয়ে ছেলমাষ্টা, বিষয় আর খেলালী হয়ে ওঠে। কেবল ওর
চোষ্টটাত তখন বন্ধ আর মূঢ়টা কেমন যেন বোকা বোকা দেখায়। কোন মহিলা যদি মিটকে করে হেসে বলে, 'তোমাকে আর হুগলো বিয়ার দেবার কথা বলবে আর্টিয়ারশ কি কিবা কিছু ধারার। তুমি তো। আজ দেখছি কিছুই খেলে না।'

আর্টিয়ারশ বিরক্ত হয়ে জবাব দেবে, 'দোহাই তোমার, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

মুহূর্তের জন্যে অবাক চোখে তাকালেও, পর মুহূর্তেই মহিলাটি বাতিলতা হয়ে উঠে গেলো। কেননা আর্টিয়ার মেজাজ তার অজানা নয়, সম্পূর্ণ মাতাল না হয়ে পড়। পরবর্তী চলার মধ্যে প্লাবন।

এমনই একটা বেসামার মুহূর্তে সেই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেলো।

কাব্জু তারি গায়ে আর্টিয়ার যখন এক ফিরে যাছিলো, অন্ধকার গলি থেকে হঠাৎ বেশ করেকজন বেরিয়ে এসে অতর্কিতে ওখানে আক্রমণ করলো। দীর্ঘদিন ধরে ওরা আর্টিয়ারকে একা পাবুনে সূক্ষ্ম ও তেঁতুল পেলো। সেদিন ওকে আয়র্কার কোন অবকাশই দিলো না। জায়গাটা কেমন গাড়ো অনেক তেমনি নিন্মবা থেকে। বাড়ি করছে চারিদিক। প্রায় ঘটাষ্ঠানের ধরে ওরা আর্টিয়ার শুরু যেকুন নির্মাণ প্রতিষ্ঠান দিলো। ঘরে পর্বতে এক সময়ে ওরা নিক্ষেপে ক্রান্তী হয়ে পড়লো। তখন ঠিক করে হলো। আর্টিয়ারে যুদ্ধের দেহে তেনে নদীর দখলে পুরনো ভাও। একটা বজ্রায় মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে।

কিন্তু চাংদোলা। করে ওকে বরে নিয়ে যাবার সময় আর্টিয়ারের জন ফিরে এলো, মনে মনে ভাবলো এক্ষেত্রে মরার ভান করে থাকাটাই সবচেয়ে ঘোষ।

আসছে যখন যেকুন তখন ওর ফেটে যাছে, সেখানের ভিতরটা তোকি কাঠ হয়ে গেছে, তবু লাঁটা দাঁত। চেপে ও কোন রকমে আর্টিয়ার চেপে রাখলো। কঠিনর ও মিশকা ভাভিলজকে চিনতে পারলো। সে তখন তার বন্ধুদের রসিয়ে রসিয়ে বলছে কেমন করে আর্টিয়ারের পিঠের পাখনার নিচে কয়েকটা মোক্ষলালের করিয়েছে, হয়তো। ওর ফুসফুস হুটোহুটো ফেটে গেছে। সুখান্ত ফুরায় বললো সে অত বোকা নয়, মায়ের অসল জায়গাটা হলো। পেটে, পেটে ধীরভাবে তৃপ্ত চালাতে পারলে যত গায়ে জোর ধার না, কেনা, বাটাকে আর টাইরাকে। করতে হবে না। লোকালেও তার সূক্ষ্মের দাবী জানাতে চাইলো না। কথা বলতে বলতেও ওরা নদীর ধারে এসে পৌঁছে গেলো, তারপর হাফাড়ে হাফাড়ে আর্টিয়ারের রক্তালো বিশ্বাস দেহটা ফুটে ফেলে দিলো। ভাড়া একটা।
বজরার মধ্যে। আর্তিয়ম একটি একটি করে ওদের পায়ের শর্ক দুরে মিলিয়ে যেতে গুনলো, তবু আমাদের চেষ্টার করেও ও মাথা তুলতে পারলো না।

পুরুষ ও অম্বর আর জোরার ভেসে-আসা। একরাশ নৌকা। আবর্জনার মধ্যে আর্তিয় নিম্নলেখা এক। চূপচাপ পড়ে রইলো। হিমেল বায়াসে অনেকটা ব্যক্তি সেলার মাথায় তুষার কৃতি তখন ও যেন ফেটে চৌচির যাচ্ছে। অথচ কাছেই শোনা যাচ্ছে নদীর মুখ কলোচ্ছাস, যেন ওর তুর্কাদাকে বিষ্ণুপুর করছে। বুকে ছোটে গিয়ে যাওয়া তো। দুর্দানের কথা, মাথাটি একটি তোলার চেষ্টা করতেই অসুখ যন্ত্রণায় গলার মধ্যে দিকে কেবল যাক্তুড়ক একটা ভাস্তব ধর্ম বেরিয়ে এলো। এমনি ভাবে আরেক-দুপুর আধো-আধুরনের মধ্যে। সারাটা রাত ও চূপচাপ পড়ে রইলো, যে বেশি জোরে আর্তনাদ করতেও সাহস পেল না।

তোরের দিকে, যদিও ওর চোখে মেলাতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে, ঠোকর ছুটে ফুলে তোলা হয়ে গেছে, তবু আগের চেয়ে যেন অনেক সহজ, কেমন যেন একটু ঝরার মনে হচ্ছে। বজরার ফাটলে চুজো তোরের আলো এসে পড়েছে ভেতরে, তরল অন্ধাম মনে হচ্ছে ঠিক যেন গোপুরিলেখায় কনে-দেখা আলোর মতো। কোন কোনে একটা হাস্তত তুলে সারা মুখে বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলো, অন্যতম করলো। কোন কোনে বুকে পেটে ভিড়ে কাপড় চাপানো। ওর জামাকাপড়ও অনেকটা করে গুলে আলগা করে দেওয়া হয়েছে, তোরের হিমেল হাওয়া কোমল একটা স্পষ্ট বুলিয়ে যাচ্ছে ওর সবাক্ষে।

‘জল থাকে বি?’

স্পষ্ট করে কিছু বোঝার আগেই আর্তিয়ম দেখলো। মুখের ওপর থেকে ওর হাতটা। সুরিয়ে দিয়ে যেন বোতলের একটা মুখ ওর ঠোকরের সামনে এগিয়ে ধরেছে। অকঠাম পান করার পর লোকটা কে জানার জন্যে আর্তিয়ম উদ্ধৃত হয়ে উঠলো। কিছু কিছুতে মাথা ঘোরাতে পারলো না। তখন অনুরত ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় মীনতির মতো। করুণ যে বললো, ‘আমাকে যদি এক গোলাস বাণি থাওয়াতে পারো, আর বাণি দিয়েই থানকটা মালিক করে দিয়ে পারে। তাহলে হয়তো উঠতে পারবে।’

‘পারবে না। সারা শরীরে ফুলে কালোরিন পড়ে গাছতে।’ তবে এক বোতল বাণি আমি আগে থেকেই সহজ করে দিয়ে এসেছিলেম।

অস্পষ্ট যুদ্ধ কঠিনের আর্তিয়ম বুঝতে পারলো না—সে নারী, না কিশোর। তবু বললে, ‘বোতলটা আমাকে দাও।’
কেন ও আর্তিয়ম

ধুয়ে এক-চতুর্থাংশ গান করার পর আর্তিয়ম গভীর দীর্ঘনাশ ফেললে। নটোল তুষ্টতার মধ্যে অদৃশ্য শোনা। যাছো জল-চেষ্টায়ের একটো চুল-চলাত আর্তনাদ, অনেক দূষ তেমন সেলা শা আসছে ভারী মলার গান। সবুজ শাও লালে পাড়া হাড়-পাঁজারা বার করা বিশাল বজরার জীব কাঠামোটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আর্তিয়ম চুপচাপ চুলে রোল। হঠাৎ ওর কেন জানি মনে হলো। এই মুহূর্তে যদি ছাগা ছাগুড় করে ধেস পড়ে তার বুকের ওপর, যদি তাকে নিচিচে করে দেয়। তখন নিজের ওপর ওর নিজেরই কেমন যেন করুন। হলো, পরমশুজ্জন চাপা কোথে আগ্রহ হয়ে উঠলো। চাপা মুঘল চোরো। যদি 
কোন দিন আবার নিজের পায়ে শক্ত হয় চালাড়ে পাড়া। রাগে হুমুখে সুদর আয়ত চোখচোরো ওর জলে ভরে উঠলো, বড় বড় উঁচু কোনো চোরো চোরো বেয়ে টপল করে ঝরে পড়লো। মাটিতে। আর এক তখনবাদ ও জুনলো মাথার সামনে অস্ফুট চাপা গলায় কে যেন তুষ্ণে তুষ্নে কাঁদে, যেন কে ওকে বিদ্বন্তকরে করছে।

‘তুমি আবার কাঁদে? কেন?’ চাপা বিরক্তিতে আর্তিয়ম ধমক দিলো, যেন যেন ও কেমন যেন তাও গেলো। কিন্তু কেউ ওর এমনের জবাব দিলো না।

তখন শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে আর্তিয়ম কসমুরীর ওপর ভর রেখে মাথা তুললো, আহত পশ্চাৎ মতে। অস্ত্র নয়নায়া আস্তনাদ করে উঠলো, তবু অস্পষ্ট আলাদা-আধারীর মধ্যেই ও দেখলো বজরার এক কোণে তালকোলা পাকিয়ে বসে রয়েছে ছোট-খাটো। একটা মুর্তি। মুর্তিটা নিস্কেন্দ্রে একটা বালকের। শীতল হাতে হাতে ছোট ছোট শক্ত করে জড়িয়ে হাতের মধ্যে যুথ খুলে ফুলে ফুলে কাঁদে, কেপে কেপে উঠলে ছোট কাথ ছুটে।

‘এই যে, এদিকে শোন।’

কেউ সাড়া দিলো না। অনন্য বিরক্তিতে বাগে আর্তিয়ম চাপা গর্জন করে উঠলো। ‘এদে বলছি।’

‘কেন, আমি তোমার কি অসুবিধে করেছি?’ এবার শোনা গেলো। চাপা চাপা চাপা। তোরু একটা কথার। ‘এত চেঁচাছে কেন? তোমাকে পরিহার করে ধুইয়ে মুছিয়ে মুখে জল দিয়েছি, বাপ্তি দিয়েছি। সারারাত যখন যন্ত্রায় ছোটফট করেছে, মাথায় হাত রুলিয়ে দিয়েছি, মনে মনে চোখের জল ফেলেছি। আর তার বললে তুমি এখন আমাকে ধমকাচ্ছে।’

‘একি! কেন, তুমি?’ আর্তিয়ম অবাক হয়ে গেলো। ’
গাকিছে শেষ গল্প

'কেন, এতে এত অবাক হবার কি আছে?'

'তাহলে তুমিই এই সব করেছেন? তারি অনুতে তো। ঠিক আছে, এখন আমার সামনে এলে বোলে।' মনে মনে আর্তিরম যেমন বিস্মিত হলেন, কুখি হলে। তার চাকিতেও বেশি। ইহুদির অসহায় করণ চোখের দিকে তাকিয়ে ও হেসে ফেলে। 'ঠিক আছে, এখন আমাকে আর ভয় করতে হবে না।'

কেন হামাগাড়ি দিয়ে এগিয়ে এলে, সতর্ক তীরু চোখে এমন ভাবে ওর মুখের দিকে তাকালে। যেন আর্তিরম এখনি ওর ভাবী ঠ্যাংটা। চাপিয়ে দেবে তার কাঠের উপর।

'তাহলে তুমিই এসব করেছে! কে তোমাকে পাঠিয়েছে? আমরি কি?'

'কেউ আমাকে পাঠাতে নির্দেশ গরঙ্গেই এসেছি।'

'নিজের গরঙ্গে? মিথ্যা কথা।'

'মিথ্যা নয়। কাল রাতের গোবিলকায় বসে যখন চা খারিয়ুম, তোমার সম্পর্কে ওরা বলাবলি করছিলো। এখনে আমি বিখ্যাত করতে পারিনি।

দৈত্যের মতো। একবার একটা চেহারাই কি করে সন্ত্বনা বলে। তাই আমি মনে মনে হেসেছিলুম। কিছু পরে অনেককেই আলোচনা করতে শুনলুম ওরা নাকি তোমাকে জন্মের মতো। সাবাড়ি করে দিয়েছে, দেখলে সবাই খুব খুশি। শেষ পর্যন্ত খুঁজতে খুঁজতে তোমাকে এখানে পেলুম। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মালাশারকে এভাবে নাটিতে পড়ে গেলাটে দেখে আমার চোখ ফেটে জল এল। আমি তোমার সেবায়ত্ত করলুম। অবশ্য আমি জানতে এসব তুমি কোন দিনই বিশ্বাস করতে না, কেননা আমি ইহুদি ইহুদিদের তুমি খুশি করে।'

'শৌচনো, কেনি,' আর্তিরম মনে মনে অপনি সেয়ে করলে। তবু ঘটতী সন্ত্বন শোভন ভূমিতে অধিক থমথমে গলায় হাতে হাত চেপে বললে, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কোনদিন তোমার গায়ে হাত দেবে না। আর কেউ যদি তোমাকে স্পর্শ করে, তাকে আমি হিঁড়ে টুকে। টুকে। করে ফেলবে। বুঝলে?'

'আঃ, আমি জানতুম, আর্তিরম! তুমি অন্য আর পাচজনের মতো নোংরা নও। তুমি আমাকে মারতে আমি হঠাৎ বলে নর! আমি তোমার চেয়ে দূর্বল বলে। মত্তি বলছি আর্তিরম, তোমাকে যেমন ভয় করতুম, মনে মনে তোমার ভালো বাসতুম। তোমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতুম আর ভাবতুম আর্তিরম তো। নয়, যেন গ্যামন, যেকোন মুখুর্তে তুমি সিংহের চোরাল ধরে টেনে হিঁড়ে ফেলতে পারো। তোমার তুলনায় আমি তো একটা মাছি বলে?'
'হঃ, তা বটে!' আর্তিয়ম গতীর লীরখাস কোলে। মনে মনে অবাক হয়ে ভাবলে মেয়েরা। নয়, ওর কোন বছরও নয়, কুন সাধারণের একজন ইহুদি, যাকে ও বহুবার নিয়মভাবে প্রহার করেছে, আমি সেই কিছু ওর জীবন ফিরিয়ে দিলে। ওরা শুশ্রুষা করে ওকে বাঁচিয়ে তুললে।

চাপা উত্তেজনায় কেনের সার। শরীরের চিত্তেরির করে উঠলো। আর সেখে আর্তিয়মের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তাই তুমি যখন কাদঝিলে আমি কেঁদে ফেলছিলে, আর্তিয়ম।'

'তখন আমি তোমাকে চিনতে পারিনি, কেন। ভেবেছিলে আমাকে কেউ বৃথক ঠাট্টা করছে।'

'সার। রাত্যে জেগে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি যাতে তোমার শক্তি আবার ফিরে আসে। দেখো, তুমি খুব শিগলই টাল হয়ে উঠবে, আর্তিয়ম।'

'নিশ্চয়ই, এখনই বেশ সুস্থ বোধ করছি। আগে আমি ভালো করে সেরে উঠি, তারপর তোমার গায়ে কে হাত দেয় একবার দেখবো।' একটু নিশ্চিন্তায় পর আর্তিয়ম মান ঠোঁটে হাগলে। 'বীরিয় ধিয়ে পেয়েছে, আমাকে কেন্দ্র খাওয়াতে পারে, কেন?'

কেন। একম ক্ষুদ্র লাফিয়ে উঠলো। যে মাঝাটাই তার বজ্রায় কড়িতে করে ঠুকে গেলো। আর্তিয়ম মুখে ফেরালে। 'একটু দেখে উঠবে তো। এট তাড়া-ভালি করার কি আছে?'

'না, খাবার এখানেই আছে। তুমি বেঁচে আছে। দেখে আমি ব্রাহ্মণ খাবার ভবা। সবই জোগাতে করে এনে রেখেছি। বলা যায় না কখন কোনে কাজ লাগে ...'

'ভবা কাঁও এনেছে।! তাহলে আমার একটা উপকার করে দাও, কেন। খাবার এখান চাই না, তুমি বরং আমাকে ভবা। দিয়ে একটু মালিশ করে দাও, আমি তোমাকে অনেক টাকা। দেবো। পারবে তো। না কি রাগ করবে?'

'আর না না, রাগ করবে কেন? তোমার জুন্সে আমি সব করতে পারি। তাছাড়া তোমাকে এক্ষণে আছাসে মালিশ করে দেবো। অনেক ভালো। ভালো। ভালোরেও তা পাবে না।'

'বার, তাহলে পুডু এক ভোটল ভবা। দিয়েই মালিশ করে দাও। হঃ এক ঘটার মধ্যে আমি আবার ঠিক হয়ে যাবে।'

'হঃ এক ঘটার মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। না, আমার কিন্তু তা মনে হয় না।'
গফিরের শেষ গল্প

‘বেশ, তুমি নিজ চোখেই দেখো! আগে একটু ভালো করে মালিশ করে
দাও, তারপর পাহাড়তলির নিচে কুটিওয়ালী মোকেন্দ্রাকে গিয়ে বলো। আমি
ওর ওখানে কয়েক দিন থাকবো, ও যেন সব বাস্ত্রকে রাখে।’

ছু হাতের চেটোয় খানিকটা ভাড়া। চেলে ওর বুকে ঘষতে ঘষতে কেন্দ্র
বললে, ‘না, আমি তোমাকে অবশ্য করছি না, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি……’

‘ঠিক আছে, আর একটু পরেই দেখো! আরে না না, আমার লাগবে না,
তুমি বরং আরও কোন জোরে ঘষো ঘষো ঘষো……ইয়া। এবার ঠিক হচ্ছে! বুকে কেন্দ্র
এ পঃটালীতে মেয়েরাই হলো। যত নেটের মুল।’

কেন্দ্র হাতে হাতে বললো, ‘অল্প আবার ওরা না হলেও চলে না।’

এই তা বেলা! আতিষ্ণু হাসলে। টান টান করে মেলে-দেওয়া অর্থ নগ
ফুল-ঢঢ। দেহে ও এখন সত্যিই বিশাল একটা দৈত্যের মতো। শুরু রয়েছে,
আর কেন্দ্র অন্তুত নিপুণতায় ওকে সমানে দলাই-মলাই করে চলছে।

একটু পরে আতিষ্ণু জিগেস করলে, ‘কি বলার, কথা বলছে না যে?‘

‘ভাবছি ওরা যদি জানতে পারে আমি তোমাকে সাহায্য করেছি, তাহলে
কিন্তু আমাকে আর আত্মী রাখবে না।’

আতিষ্ণু হাসল। করে হেসে উঠলে। ‘ঠিক আছে, দেখবে কে কাকে
আস্তা রাখে!’

আতিষ্ণুর হেসে ওঠার উঁচি। ওর কঠিন জন্যে কেন্দ্র অবাক হয়ে গেলো,
যেন তার অবরুদ্ধ মনের ভয়টাকে কেন্দ্রসংযোগে উড়িয়ে নিয়ে গেলো ও।

প্রায় মাস থানেক কেটে গেছে।

একদিন ঘুমুরে, দুক-শামক আর কুঁড়ির মায়ের ভিড়ে সংকীর্ণ গলিটা। তখন
গিজগীজ করছে, ঠাঁঠাঁ থমথম চাপা একটা উত্তেজনায় সিকানের সবাই চমকে
উঠলে। কে যেন চাপা গলায় কিসফিস করে বললেঃ ‘এই, আতিষ্ণু আসছে!’

গলির ঘুমার ঢুঁড়ে যেসব ফেরিওয়ালা খাবার নিয়ে বেঁচেছিলো। চোখের
নিম্নে তারা কোথায় যেন উঠাও হয়ে গেলো। আর যারা পথ চলছিলো,
তারা সবাই অবাক হয়ে মরমি গুঞ্জনের দিকে ফিরে তাকালে। আতিষ্ণু
কিন্তু আগের মতো নৈবে একই ভঙ্গিতে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে রাস্তার
মাঝখান দিয়ে হেলে ছুলে মস্তক পায়ে অগ্রে আসছে। খালি বুক, হলদে
কুড়িটা চাপা। কাঠের ওপর, মাথার খুলিটা। এক পাশে হেলানো, কালো
কেন ও আর্তিয়ম

চুলের কয়েকটা ঘূঁটী এসে পড়েছে ঘামে-ড়েজ। গোড়া কপালের গর্ম। পরিবর্তনের মধ্যে কেবল ওর অন্যান্যস্তর মুখট। এখন যেন আরও বেশি বুদ্ধিজীবী, আয়ত চোখের দৃষ্টিক। আরও বেশি শানিত আর প্রেম বলে মনে হচ্ছে।

রান্তার সবাই শুধু বিশ্যে ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আর কেমন করে এমন সুদর শক্তিশালী একট। মানুষকে কেউ মারতে পারে সে নিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে। কেউ কেউ কল্পনায়ও ওর শক্তিদ্বন্দে লোক-জনদের এবার কি হাল-হবে ভাবতেই মনে মনে শিউরে উঠছে। অধিকাংশই আতিয়মের হঠাৎ এই অবির্ভাবে যেন মন্যমূল্য হয়ে গেলো।

আতিয়ম গ্রেবিল্লক। পানিশালায় এসে পৌঁছালে। নিচু ছাদওয়াল। লম্বা টানা ঘরের ভিতরে তখন মাটি অল্প করেকরণে বসেছিলো, সার। দরজায় আতিয়মকে প্রবেশ করতে দেখে দুই একজন বিশ্যে অন্যজানান্দ করে উঠলো। একজন তো। চকিতে চেয়ারের ছেড়ে উঠে ঘাড়চারছরের এক কোণায় গিয়ে লুকলো। বিশেষ কারণ দিকে না। তাকিয়ে আতিয়ম ধীরে ধীরে সারা ঘর একবার চোখে বুঝিয়ে নিলো। পানিশালার মালিক সাভকা ব্লেমিকের হু-পা এগিয়ে এসে বিনীত ভঙ্গিতে অভিবাদন জানালো।

আতিয়ম জিগসে করলো, ‘কেন এখানে এসেছিলো?’

‘একথুনি আসা বে। সাধারণত ও টিকিনের এই সময়েকেই আসে বে।’

জানলো ঘরের একট। চেয়ারে হাত পা ছুড়িয়ে বসে আতিয়ম চায়ের ফরমাস দিলো।

সারা ঘরে জনা দশক লোক, অধিকাংশই শ্রমিক, যারা এতাংশ আতিয়মের দিকে জুলজুল করে তাকাফিলো। একবার ওর চোখে পড়েতে এমনভাবে হাসলো, যেন ওর জন্যে ওরা এতদিন উদ্দীপিত হয়েছিলো। কিন্তু আতিয়মকে কিছু বলতে বে। দেখে ওরা আর আগ-বাড়িতে কিছু জিগসে করতে সাহস পেলো না। বাইরের রান্তা থেকে একটু চিত্কার ছেলামেছি, অল্পী বিকির্ণ ফেরিওলাসদের হঁক পোলায়। শান-সাধারণো পাথরের কোথায় যেন একটা বলতল আছে ফে নন্নন্নন শব্দে ভেঙে গেলো। ভেতরের বদল বাতাসে নাতকীয় এই স্ব্যবহার আতিয়ম হঠাৎ কেমন যেন ক্ষেপে গেলো। অসম্ভব বড়া গলায় ও চিত্কার করে উঠলো, ‘এই নেকড়েযুগো ভেড়াগুলো, আমার দিকে সার্কাপ অমন হৈ করে তাকিয়ে দেখছে কি?’

‘আমার তোমার সকল কথা বলার জন্যে ছটফট করছি, আতিয়ম। ল্যাংটা-
গল্পের শেষ গল্প

বর তার চেয়ার ছেড়ে পায়ে পায়ে অতিন্মের দিকে এগিয়ে এলো। ছোট-খাটো মানুষ, থুতনির ওপর পাতলা একটু হুর, গায়ে ক্যাবিসের কামিজ, পরনে সেলাইদের পাতলুন। অতিন্মের উলটো দিকের চেয়ারে সে বসলো। ‘তুমি অসুস্থ ছিলে শুনলুম?’

‘তাতে কার কি?’

‘না, কিছু নয়...এই এমনি, অনেকদিন তোমাকে দেখিনি, তাই শুধু...কি হয়েছিলো...’

‘মিঠো কথা!’ অতিন্ম গর্জে উঠলো। ‘কি হয়েছিলো। তুমি জানতে না?’

‘ইলা, জানতুম।’

‘বাটা সানায়ের-গো। কোথাকার, তাহলে মিঠো কথা বলার দরকার কি ছিলো?’

‘সত্যি বললে তুমি হয়তো রেগে যেতে। অতিন্ম।’

‘হ’।

আর কোন কথা না বলে অতিন্মকে গম মেরে থাকতে দেখে লাংটেবাবরের সাহস বেঁধে গেলো। ‘তোমার সেরে ওঠার জন্যে আমাদের এক বোতল ভাদকা খাইয়ে দাও, অতিন্ম।’

‘নাও।’

‘ধর্মাবাদ! সত্যিই তোমার মনটা খুব ভালো, অতিন্ম।’

‘আর যাই হোক, তোমাদের মতো। অন্য নাংরা নয়।’

এমন সময় দরজার সামনে কেন্দ্রকে দেখা গেলো। বুকের কাছে ঝোলার কাঠের বাঁক। ভেতরে পা বাড়াবার আগে সারসের মতো গলাটা বাঁটিয়ে দিয়ে সে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকালো। ঠোঁটের কোণে সেই একই তাম চাপা হাসি। হঠাৎ অতিন্মের চোখে চোখ পড়তেই সারা মুখ তার অবধ হাসিতে মেনে বললো করে উঠলো।

‘আর কেনু, তুমি! এসো এসো।’ লাংটেবাবরের মুখের দিকে পাড়চোখে তাকিয়ে পিলে-চমকানো গলায় বললো, ‘এখন ভাগে। এখান থেকে।’

লাংটেবাবর একবার অতিন্ম আর একবার নিঃশব্দে গোটোটো এগিয়ে-আস। কেনের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলো। তারপর মুখ কালো করে ধীরে ধীরে নিজের টেবিলে ফিরে গেলো। তার বন্ধুর। বজ্রের ভাবিতে হেসে উঠলো।”
কেনু ও আতিষয়ম

আতিষয়মকে দেখে কেনু যেমন খুশি হলো, ল্যাংটো-বরের বন্ধুদের উইভাবে
হাসতে দেখে ভয় গেল। তার চাহিতে কম নয়। তাকে ওদের দিকে করপূর্ণ
চোখে ধাঁকেতে দেখে আতিষয়ম বললে, ‘আর বোদে। ওগুলো তো বেড়ার
বাছাই, ওদের এমন ভয় পাবার কিছু নেই। তারপর কি খাবে বলো? নিশ্চয়ই
তোমার খুব থিদে পেয়েছে।’

কেনু বসলো বটে, কিন্তু আগ্রাস চেতা করেও কিছু বলতে পারলো না।
সে তখন রীতিমত অপ্রত্যয় হয়ে গেছে। তাছাড়া ল্যাংটো-বর উঠে হাঁড়িয়ে
হাত নেড়ে কি যেন বললে।

আতিষয়ম চেঁচিয়ে উঠলে, ‘বিড়ুবিড় না করে মরদের বাছাইর মতো জোরে
বলো।’

‘হয় তেমন থাকো। আমরা যাই, না হয় আমরা থাকি তেমন যাও।’

আতিষয়মের চোখচুটি হিংস্র বাঢ়ির মতো আসে উঠলো। ‘বুঝতে পেরেছি,
ইহুদিটার সঙ্গে আমার দাঁড়িতে দেখে তোমাদের গায়ে আলা ধরেছে। তোমার
জানানেও যেতে পারলো, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে তোমাদের একটা
কথা আগে থেকে সারাধাম করে রাখছি...গায়ে হাত দেওয়া তো দুরের কথা,
কেউ যদি একে নিয়ে হাসি-ঠাট্টিও করে। আমি কাউকে অন্তে। রাখবে না,
সোজা যায়ে। কবর দোবে, বুঝলে?’

আবেগে বিষ্মে কেনের ছোটো মুখখান। আরও বির্ভ হয়ে গেল। কোন
দিকে সে চোখ তুলে তাকাতে পারলো না। আতিষয়মের ছোটোটাটো নেড়ার
মতো বিশালা খালি বুকখানার দিকে সে নত চোখে তাকিয়ে রইলো।

ঘরের ওপার থেকে যুদ্ধ ঘন্টে শোন। গেলো। তারপরেই ল্যাংটো-বর আর
তার সদিশা এক এক করে বাইরে বেরিয়ে গেল।। আতিষয়ম তাকিয়ে দেখলো।
ঘরের মধ্যে ঘুরু ওয়া ঘুর্ণন আর বিক্রেতার চেরিলে বল রয়েছে সাঁতুক।

আতিষয়মের ধখলে মুখের দিকে তাকিয়ে সাঁতুক। ঘুর্ণ চোখে হাসলে।
‘তুমি ঠিক করেছে। আতিষয়ম। ওগুলো সবকটা মিটমিটে শয়তান।’

আতিষয়ম মন তার কথাগুলো শুনতে পেলা না, ঝুলল। তার প্রতিদ্বন্দী।
প্রতিধ্বনিত শব্দগুলো কেনু যেমন উপহাসের মতো ওর কানে এসে বাজলো।
ভাবি হয়ে চেপে বসলো। ওর বুকের ওপর। আতিষয়ম মন মনে ছটফট করে
উঠলো। কেনএর দিকে তাকিয়ে দেখলো পেয়ালা থেকে খানিকটা গরম চা
পিরচে চেলে সে নিকট মনে ফুঁ দিখে, তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে পিচিচটা।
গাঁকির শ্রেষ্ঠ গল্প

মুখের সামনে তুলে ধীরে ধীরে চমক দিচ্ছে। আতিষ্ঠাম যত তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে তেজই হতাশ হয়ে যাচ্ছে—না, ওটা সুতিয়া তীরু। ওকে রক্ষা করা আর বনের আগাছার নিয়ান্ত্রণ, হুই সমান।

‘তুমি কি এখনও আমাকে ভয় পাচ্ছে? না? কেনু?’ কঠোর ও রূঢ় তার মনের বিরুদ্ধে ধরে রাখতে পারলেন না। ‘কি বল্লার, কথা বললে না যে?’

‘কি বলবে আতিষ্ঠাম?’ কেনু যখন মুখ তুললেন, মনে হলো তার সার। মুখে কে যেন পরাজ্যের প্রাণী মাখিয়ে দিয়েছে। ‘বলা উচিত কিনা আমি সেইটাই রুদ্ধতে পারি না। আমি রুদ্ধতে পারি আমার পাশে বসতে তোমার লজ্জা করছে।’ সে তে। স্বাভাবিক। কোথায় আমি আর কোথায় তুমি? সত্যি আতিষ্ঠাম, যখন তোমার কথা ভাবি আমার জুড়াস মার্কাবিয়ারের কথ। মনে পড়ে যায়। ঈশ্বরের তোমাকে কি উদ্দেশে সৃষ্টি করেছেন কে বলতে পারে বলে? অথচ তোমার তুলনায় আমি কত কত তুচ্ছ! তুমি কল্পনাকে করতে পারবে না আতিষ্ঠাম, দিন রাত আমি কত ভেবেছি, তবু আজ পর্য্যন্ত রুদ্ধতে পারলুম না এ পৃথিবীতে আমার জীবনের মূলা কতস্কু।’

কেনুর কথাগুলো আতিষ্ঠাম স্পষ্ট হতে পারলেন না, তবে একটু রুদ্ধতে পারলেন। কোথায় যেন তার একটা অভিযোগ রয়েছে। আর কথাটা মনে হতেই ক্লান্ত একটা বিষ্ণুতায় সার। মন ওর ভরে উঠলো। ‘দেখো কেনু, তোমাকে তো বলেছি—তোমার দেখা শোনার সময় দায়িত্ব আমার, নাকি বলিনি?’

‘ইহা, তা বলেছ!” কেনু স্নান ঠোঁটে হাসলেন। ‘কিন্তু ঈশ্বরের ঈশ্বার বিশ্বে তুমি আমাকে কেমন করে বীঝাবে, আতিষ্ঠাম?’

‘না, ঈশ্বরের ঈশ্বার বিশ্বে আমি যেতে পারি না।’ ও খোলাগুলিই বীঝার করলো। ‘তা ছাড়া ঈশ্বরের বিশ্বে আমি যেতেও চাই না।’ কেনুর শিশুর স্নান মুখের দিকে তাকিয়ে আতিষ্ঠাম কি যেন ভাবলেন। ‘তুমি বিয়ে করেছে।’

‘ইহা, আমার বিরাট পরিবার।’ কেনু গল্পের একটা দীর্ঘকাল ফেলে বললেন, ‘অন্তত আমার শক্তির তুলনায় বিরাট তো বটেই।’

‘তাই নাকি?’ আতিষ্ঠাম কল্পনার করতে পারলেন না। এই রকম অন্তুত হুবল ভীরু ছোটহাটে একটা ঈশ্বারকে কেনু মেয়ে আলোবাসতে পারে।

‘পঁচাটা ছেলেমেয়ের মধ্যে একটা মারা গিয়েছে। বউটাও আবার জন্মায় জীবনে তুচ্ছ হুকুমাকে তরিয়া বলেছে...’

‘তাহলে তো তোমার এখন কী হবে দুঃখসময়! আতিষ্ঠামের মনে এবার সুতিয়াই